রপ্তানীযোগ্য আলু উৎপাদন কৌশল
মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

(Field Training Manual on Exportable Potato Production)

Prepared by:
PRICE-USAID

সূচীপত্র

১. আলু-ফসলের উদ্ভব এবং ক্রমবিস্তার ৩
২. বাংলাদেশে আলুর চাষ ৫
ক. উৎপাদনের সাধারণ তথ্য ৫
খ. রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য ৬

৩. রপ্তানীযোগ্য আলু উৎপাদনে বিবেচ্য বিষয় ও পরিকল্পিত কাজ
৪. চাষের আগে করণীয় মাঠের বাইরের কাজ ৭
(৪.১) প্রস্তুতিমূলক সাংগঠণিক কাজ ১০
ক. এলাকা নির্বাচন ঃ ১০টি প্রধান বিবেচ্য দিক ১০
খ. কৃষক নির্বাচন ঃ মৌলিক বিবেচ্য বিষয়াদি ১২
(৪.২) প্রস্তুতিমূলক কৃষি সংক্রান্ত কাজ ১৩
ক. রপ্তানিযোগ্য আলুর জাতসমুহের নাম-পরিচয় ১৩
খ. গ্রানুলা জাতের পরিচিতি ১৪
গ. ডায়মন্ট জাতের পরিচিতি ১৪
ঘ. বীজআলুর গুণমান ১৫
ঙ. বীজআলু সরবরাহ ১৬

৫. রপ্তানিযোগ্য আলুচাষে মাঠের কাজ
ক. বীজআলু বপনের সময় ১৭
খ. জমি প্রস্তুতকরণ, সার প্রয়োগ ১৭
গ. আলু ফসলে সেচ প্রযোগ ১৭
ঘ. অন্তর্বর্তীকালীণ পরিচর্যা ১৯
ঙ. ‘রোগিং’ , ‘হ্যাম পুলিং’ ২০
চ. আলু তোলা এবং ‘কিউরিং’ ২০
ছ. রপ্তানিযোগ্য আলু বাছাই এবং ‘গ্রেডিং’ ২১

৫. আলুর ফসল সংরক্ষণ:কয়েকটি বিশেষ ক্ষতিকর পোকামাকড় এবং দমন পদ্ধতি ২৩
,, ,, ,, রোগবালাই ,, ,, ,, ২৪

আলু ফসলের উদ্ভব এবং ক্রমবিস্তার

বহুমুখী ব্যবহারিক উপযোগিতার বিবেচনায় বিশ্বের কোথাও কোথাও আলুর পরিচিতি প্রধান খাদ্য হিসাবে আর কোথাও প্রধান বিকল্প খাদ্য হিসাবে। তবে বাংলাদেশে এবং বিশ্বের প্রায় সব দেশেই সর্ব-প্রধান সব্জি হিসাবে আলু ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া 'স্টার্চ' (শ্বেতসার) উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসাবেও আলু ব্যাপকভাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং আলুকে যখন যেভাবে ব্যবহার করা হয়, সেভাবেই বলা যেতে পারে - প্রধান খাদ্য, প্রধান বিকল্প খাদ্য, সব্জি অথবা শিল্পের কাঁচামাল । আলুকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল হিসাবেই বিবেচনা করতে পারি, যা আমাদের দেশে সারাবছরই সব্জি হিসাবে বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের প্রসারমান খাদ্য-সংকট মোকাবেলায় অন্যতম প্রধান বিকল্প খাদ্য হিসাবে আলুকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যেও সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিশ্বের ৪০টি উন্নত দেশের মানুষ প্রধান খাদ্য বা বিকল্প প্রধান খাদ্য হিসাবে আলু খেয়ে থাকে। জনসংখ্যা এবং খাদ্য-সংকট বৃদ্ধির কারণে বিশ্বজুড়েই আলুর চাহিদা বাড়ছে। বিজ্ঞানী, পুষ্টিবিদ ও ত্রাণ-সহায়তা বিশেষজ্ঞরা ক্রমেই একমত হচ্ছেন যে, "উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য সরবরাহ স্থিতিশীল রাখতে এতদিন অবহেলিত আলু আরও বৃহত্তর ভূমিকা রাখতে পারে"

মানুষের খাদ্য হিসাবে আলুর বিকাশ-প্রসারের ইতিহাস সুপ্রাচীণ এবং খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। প্রায় ৮০০০ বছর আগে 'ইনকা সভ্যতা'র সময়ে যাযাবর 'রেড ইন্ডিয়ান' মানুষজন দক্ষিণ আমেরিকার আন্ডিজ পর্বতমালায় ১২ হাজার ফুট উচ্চতায় প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন আলু সংগ্রহ করতো। কালক্রমে তারাই প্রথম আলু-চাষ শুরু করেছিল এবং আলুই হয়ে উঠেছিল ইন্‌কা সভ্যতার মেরুদন্ড।

আজ বিশ্বজুড়ে ১৩০-১৪০টি দেশের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কৃষি-ফসল হয়ে উঠেছে, যার সামগ্রিক বাজার মূল্য এখন ২০ হাজার কোটি টাকার কম নয়।

> বিশ্বের ১৩০-১৪০টি দেশে প্রতিবছর উৎপাদিত এবং ব্যবহৃত আলুর মোট বাজার-মূল্য ২০ হাজার কোটি টাকার কম নয় ॥

স্পেনীয়রা ১৫৭০-'৮০ সালের মধ্যেই আলু নিয়ে এসেছিল ইউরোপে। ইংল্যান্ডে আলু পরিচিত হয়ে উঠে ১৫৮৬সালে এবং সম্ভবত স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ১৫৯৭সালের মধ্যেই আয়ার্ল্যান্ডে আলুকে পরিচিত করিয়েছিলেন। আইরিশদের কাছে আলু যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা' বোঝা যায় তাদের একটি লোক-বচনে, "আয়ার্ল্যান্ডের সত্যিকার স্বর্ণ বিধাতার দান, এমন একটি ফল শিকড়েতে যার স্থান"। আরেকটি আইরিশ লোক-বচন, "যা খুশী তা নিয়ে ঠাট্টা করতে পারো, কিন্তু আলু ও বিবাহ এ দুটো নিয়ে কোনো ঠাট্টা নয়"। সবারই জানা আছে, ১৮৪৬-'৪৭ সালে 'লেট ব্লাইট' রোগে আলু ফসলের ব্যাপক বিনাশের কারণে খাদ্যাভাবে মারা গিয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। আর এ ঘটনাটি তাদের কাছে 'ব্লাক-১৮৪৭' নামে পরিচিত হয়ে আছে।

১৬০০ সালের স্কটল্যান্ডে আলুর আগমন ঘটেছিল। অতঃপর আইরিশ অভিবাসীদের মাধ্যমে আলু পরিচিত হয় যুক্তরাষ্ট্রে। ইউরোপীয়রাই ১৬১৫সালের দিকে আলু নিয়ে এসেছিল ভারতীয় উপমহাদেশে এবং এর কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের পার্বত্য এলাকায় আলু চাষের শুরু হয়েছিল। চীনদেশে আলু পরিচিতি পেয়েছিল ১৬৫০-১৭০০ সালের মধ্যে। তারপরেই একদেশ থেকে অন্যদেশ করে বিশ্বজুড়েই আলুর পরিচিতি-প্রসার ঘটতে থাকে। মোট আলু উৎপাদনের দিক থেকে বর্তমান বিশ্বে চীন ও ভারত যথাক্রমে ১ম এবং ৩য় স্থানে রয়েছে।

> **বাংলাদেশে সম্ভবত নওগাঁ জেলার পতিসর অঞ্চলে ১৯০০ ইং আলুর আবাদ শুরু হয়েছিল ॥**

আমাদের বাংলাদেশ ভূখন্ডে ঠিক কখন আলুর চাষ শুরু হয়েছিল, তার কোনো প্রত্যক্ষ তথ্য মেলে না। তবে একটা পরোক্ষ তথ্যে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের পরিকল্পিত কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে বর্তমান নওগাঁ জেলার পতিসর অঞ্চলে ১৯০০ সালের দিকে প্রথম আলুচাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি

বাংলাদেশের মাটি এবং জলবায়ু আলু চাষের জন্য খুবই উপযোগী। পার্বত্য অঞ্চল এবং দক্ষিণের অতি-লবণাক্ত অঞ্চল ছাড়া প্রায় সকল অঞ্চলেই শীতকালীণ ফসল হিসাবে আলু উৎপাদন করা চলে। বাংলাদেশের ২০০৫-'১০ সালের জন্য বিভিন্ন ফসলের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রায় উল্লেখ ছিল, "আলুর জমির বর্তমান যে পরিমান রয়েছে, আগামী বছরগুলোতে এমনই থাকবে বলে আন্দাজ করা যায়"। সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় দেখানো হয়েছিল, ২০০৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা ৪.০০লক্ষ হেক্টর, ২০০৬ সালে ৪.০৫ লক্ষ হেক্টর এবং ২০০৭-২০১০ সালে বার্ষিক ৪.১০লক্ষ হেক্টরে আলু চাষ করা হবে। কিন্তু ২০০৭-'০৮ বছরে হঠাৎ করেই আলুর আবাদ বেড়ে দাঁড়ায় ৫.২০লক্ষ হেক্টর, ফলণ হয়েছিল প্রায় ৮০ লক্ষ মে.টন। দেশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন, সংরক্ষণ সুবিধা এবং সম্ভাব্য রফতানি চাহিদার তূলণায় অপরিকল্পিত বাড়তি উৎপাদনের কারণে ক্ষতি হয়েছে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই।

ভবিষ্যতে দেশে আলু উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রনয়নের ব্যাপারে এ বছরের অভিজ্ঞতা সকলেরই স্মরণ রাখা দরকার। এখানে প্রসঙ্গত বিশেষভাবে বলা দরকার, আলু উৎপাদন করে রফতানি বাজার খোঁজা অপেক্ষা সম্ভাব্য বাজার নিশ্চিত করেই রফতানিকারকদের পক্ষে আলু উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশে 'ফ্রেশ' আলুর তাৎক্ষণিক বাজার রয়েছে মোটামুটি ২০লক্ষ টনের, বিদ্যমান কোল্ড স্টোরেজসমুহের সংরক্ষন ক্ষমতা ২৫লক্ষ টনের বেশি নয়, বীজ আলুর প্রয়োজন মোটামুটি ৮-১০ লক্ষ টন। সাম্প্রতিককালে আলু রফতানির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের অভিমত, বাংলাদেশ থেকে বার্ষিক আলু রফতানির পরিমান মাত্র ৬ - ৭ লক্ষ টনের মত। সব মিলিয়ে অবশ্যই বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আলুর উৎপাদনশীলতা এবং গুণগত মান উন্নয়ন করার জন্য সঠিক প্রযুক্তি অনুসরণ করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বাজার-লক্ষ্য নির্ধারণ করেই উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

সাম্প্রতিক কালে কৃষকরা আলু আবাদের লাভজনক দিকটা উপলব্ধি করতে পারছেন বলেই কৃষক পর্যায়ে আলুর গুরুত্ব বাড়ছে, বাড়ছে আলুর আবাদ। উন্নত বীজ ব্যবহার এবং প্রযুক্তি গ্রহণেও কৃষকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য মানতেই হবে, বাংলাদেশে যে হারে আলুর আবাদ বাড়ছে, তেমন করে ফলণ বাড়ছে না। গত শীত মৌসুমে (২০০৭-'০৮) বাংলাদেশে একর প্রতি আলুর গড় ফলণ ছিল ১৫.৫০ মে. টন মাত্র। গবেষণা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ মহল বলছেন, উফশী জাত, উন্নতমানের বীজ এবং কার্যকর আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে, হেক্টর প্রতি আলুর ফলণ ৩০ মে. টন পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব।

বাংলাদেশে আলুর গড় ফলণ ১৫.৫টন/একর
তবে উন্নত বীজ এবং সঠিক যত্নে
ফলণের হার ৩০.০ টন পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব ॥

কৃষিতাত্বিক এবং অর্থনৈতিক বিবেচনায় বাংলাদেশে আলুর আবাদ আরো বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে রপ্তানি বাজারের দিকে কার্যকর মনোযোগ দিতে না পারলে বাংলাদেশে লাভজনক আলু উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাবে না। কারণ, দেশে বিদ্যমান আলু সংরক্ষণ-সুবিধা এবং তাৎক্ষণিক ভোগের হিসাব মিলিয়ে আলুর অভ্যন্তরীণ চাহিদা মোটামুটি ৪৫-৫০লক্ষ টনের বেশি নয়। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট রফতানি বাজারের দিকে তাকিয়ে আলুর জাত ও মানগত চাহিদা পূরণ করতে না পারলে রপ্তানির সম্ভাব্য সুযোগও কাজে লাগানো যাবে না ॥

বাংলাদেশে আলুর চাষ

ক. সাধারণ তথ্য

☐ **বাংলা**দেশের মাটি এবং জলবায়ু আলু চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

বাংলাদেশে মোট আবাদী জমির (মোটামুটি ২০০ লক্ষ একর) প্রায় ৪-৫% অংশে শীত মৌসুমের বিশেষ পছন্দনীয় অর্থকরী ফসল হিসাবে আলুর আবাদ করা হয়। পার্বত্য অঞ্চল এবং দক্ষিণের অতি-লবণাক্ত অঞ্চল ছাড়া প্রায় সকল অঞ্চলেই শীতকালীণ ফসল হিসাবে আলু উৎপাদন করা চলে।

বিপুল জনবহুল বাংলাদেশে যখন একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে আর অপরদিকে কমছে কৃষি-জমির পরিমান, তখন আমাদের চাষবাসে পরিকল্পিত উপায়েই এমন পরিবর্তন ঘটাতে হবে, যাতে জমি থেকে কম সময়ে অধিক ফসল তোলা যায়। এমন বিবেচনায় বাংলাদেশে আলু উৎপাদনের গুরুত্ব নিতান্তই সহজবোধ্য।

☐ আলু একটি অতি উচ্চমানের অর্থকরী ফসল ।

"ছোটো চাষীর অল্প পরিমান জমি থেকে যথেষ্ট পরিমান অর্থ আয় করার জন্য আলু একটি অত্যন্ত উপযোগী শস্য"।

☐ আলুর আবাদ প্রসঙ্গে কৃষকের কয়েকটি বিবেচ্য বিষয়

- জমিতে আলুর গড় ফলণ চাল কিংবা গমের তূলণায় ৪ - ৫ গুণ।
- বোরোধানের চাষ করতে যে পরিমান পানি লাগে তা' দিয়ে ৩-৪গুণ বেশি জমিতে আলু চাষ করা চলে।
- বিরূপ আবহাওয়া বা প্রাকৃতিক প্রতিকুলতায় ধান-গমের ফলণ যত বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, আলুর ফলণ ততটা ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। আলুর ফলণ কখনো সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় বা একেবারে শূণ্য হয় না ।
- রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের দ্বারা কৃষকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ এবং দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- আলু উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিক্রয়-বিতরণের কাজে অনেক লোকের, বিশেষত মহিলাদের কর্মসংস্থান হয়।

☐ প্রতিবছর কমবেশি ১০লক্ষ একর জমিতে আলুর চাষ করা হয়।

সরকারের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছিল, ২০০৫-'১০ইং সময়ে দেশে আলুচাষের পরিমান মোটামুটি ১০লক্ষ একরে স্থির থাকবে। কিন্তু ২০০৭-'০৮ বছরে হঠাৎ করেই আলুর আবাদ বেড়ে দাঁড়ায় ১৩ লক্ষ একর এবং ফলণ প্রায় ৮০ লক্ষ মে.টন। অপরিকল্পিতভাবে হঠাৎ করে আলুর আবাদ ও উৎপাদন বেড়ে যাওয়াতে ক্ষতি হয়েছে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই।

☐ আবাদ বাড়ছে কিন্তু ফলণ তেমন করে বাড়ছে না ।

কৃষকরা আলু আবাদের লাভজনক দিকটা বুঝতে পারছেন বলেই আলুর আবাদ বাড়ছে। দেশের কৃষি-পরিবেশ এবং কৃষকের লাভলোকসানের বিবেচনায় বাংলাদেশে আলুর আবাদ আরো বাড়ানো সম্ভব। তবে মানতেই হবে, বাংলাদেশে যে হারে আলুর আবাদ বাড়ছে, তেমন করে ফলণ বাড়ছে না

☐ আলুর ফলণ অনেক বাড়ানো সম্ভব

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেন, উফশী জাত, উন্নতমানের বীজ এবং কার্যকর আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে, আলুর ফলণ একর প্রতি ৩০ মে. টন পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হতে পারে।

খ. রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য

- রপ্তানির বর্তমান পরিমান ও সম্ভাবনা

  বর্তমান পরিস্থিতিতে রপ্তানি বাজারের দিকে কার্যকর মনোযোগ দিতে না পারলে বাংলাদেশে লাভজনক আলু উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাবে না।

  গত তিন বছরে বাংলাদেশ থেকে আলু রপ্তানির পরিমান ছিল যথাক্রমে ৫,০০০ টন (২০০৫-'০৬ইং), ৬,০০০টন (২০০৬-'০৭ইং) এবং ১০,০০০ টন (২০০৭-'০৮ইং)। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে বার্ষিক আলু রপ্তানির গড় পরিমান মাত্র ৬-৭লক্ষ টনের মত। বাংলাদেশ থেকে কয়েক বছর যাবৎই প্রধানত সিংগাপুর এবং মালয়েশিয়াতে আলু রপ্তানি করা হয়।

- বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের রপ্তানি-বানিজ্যে অভিজ্ঞ মহলের বিশ্বাস, রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ (কিউরিং, সর্টিং, গ্রেডিং) ও জাহাজীকরণের কাজে সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের আলুর চাহিদা অনেক বাড়বে এবং সিংগাপুর ও মালয়েশিয়াতেও আরো বেশি পরিমানে রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

- রপ্তানি বাড়াতে হলে মনে রাখা দরকার

  সব রকমের আলু রপ্তানি করা যায় না।

  রপ্তানি-বাজারের চাহিদা অনুযায়ী জাত-নির্বাচন এবং কেবল মাত্র সুনির্দিষ্ট মানের আলু উৎপাদন করেই তা রপ্তানি করা সম্ভব হতে পারে।

***রপ্তানি বাজারে তূলণামূলক বড় আকারের আলুর চাহিদা বেশি।**

***বড় আকারের আলু ওজনেও বেশি হয়ে থাকে।**

***আলুর রপ্তানি বাজারে ওজন-ভিত্তিক দু'টি প্রচলিত গ্রেড :**

'এ' গ্রেড - ৫/৭টি আলুতে এক কেজি,

'বি' ,, - ৭/৯ টি ,, ,, ,, ।

*** 'এ' গ্রেড আলুর রপ্তানি-মূল্য 'বি' গ্রেডের মূল্য অপেক্ষা বেশি পাওয়া যায়॥**

- "জাত এবং যত্ন // দু'য়ে মিলে রত্ন"।

  বাংলাদেশের কৃষক-পর্যায়ে রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের জন্য চাহিদামত জাত-বাছাই এবং সঠিক প্রযুক্তি অনুসরণ প্রসঙ্গে "জাত এবং যত্ন // দু'য়ে মিলে রত্ন" লোকবচনটি যথার্থই সত্য॥

রপ্তানীযোগ্য আলু উৎপাদনে প্রধান প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমুহ

- আলু বাংলাদেশে রবি মৌসুমের ফসল।
- বাংলাদেশের কৃষি-আবহাওয়ার বিচারে ১৫আশ্বিন থেকে ১৫ ফাল্গুন পর্যন্ত ছয় মাস রবি মৌসুম।
- রবি মৌসুমের প্রথম দিকে এবং শেষ দিকে কয়েক সপ্তাহ সময় জুড়ে অতি বৃষ্টি এবং ঝড়ের আশঙ্কা থাকে। এ সময়ের তাপমাত্রাও উন্নতমানের আলু উৎপাদনের অনুকুল থাকে না।
- মাঘ মাসের শুরু (১৫ জানুয়ারি) থেকেই আলু ফসলে ভাইরাস-রোগের বাহক জাবপোকার উপদ্রব বাড়তে থাকে।
- ৮০ থেকে ১২০দিন বয়সী আলু ফসল তোলা যায়। তবে অন্তত ৯০ দিনের আগে তুললে আলু আকারে বিশেষ বড় হয় না এবং জলীয় ভাগ বেশি থাকে বলে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায় না।
- রবি মৌসুম শুরুর পর যথাসম্ভব আগাম আলুর আবাদ করা, সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ, মাটির অবস্থা বুঝে যথাসময়ে কয়েক বার সেচ দেয়া এবং ফসলের নিয়মিত পরিচর্যা করাই আলুর আকার বড় করা এবং ফলণ বাড়ানোর নির্ভরযোগ্য উপায়।
- মনে রাখা দরকার, 'প্লান্ট গ্রোথ হরমোন" প্রয়োগ করলে আলু আকারে বড় হয় বটে এবং ফলণও বাড়ে কিন্তু আলুর সংরক্ষণযোগ্যতা দারুণ ভাবে কমে যায়। এভাবে উৎপাদিত আলু পরিবহনকালে অথবা মজুদ অবস্থায় দ্রুত পঁচে যাবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনে কোনো অবস্থাতেই 'প্লান্ট গ্রোথ হরমোন" ব্যবহার করা উচিৎ নয়।
- সব দিক বিবেচনায় রেখে, রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের আলু উৎপাদনের জন্য, কার্তিক মাসের ২য় সপ্তাহেরর পর (নভেম্বর) থেকে যত আগাম সম্ভব আবাদ শুরু করে, সময়মত সঠিক নিয়মে ফসল পরিচর্যা করে ৯০-১০০দিনের মধ্যে আলু-ফসল তোলার লক্ষ্যেই পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

সপ্তাহওয়ারি পরিকল্পিত কাজ

সপ্তাহ	পরিকল্পিত মাঠের কাজ	মন্তব্য
১ম	▸ চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুতকরণ । ▸ প্রথম কিস্তির সার প্রয়োগ : অর্ধেক ইউরিয়া এবং অর্ধেক পটাশ সার বাদে বাকি সব সার । ▸ বীজ রোপণের নালা তৈরি এবং বীজআলু রোপণ। ▸ বীজ-সারির দু'পাশে সেচ-নালা তৈরি করে মাটি বীজ-সারির উপরে তুলে দিতে হবে।	▸ জমি তৈরির সময় সারের প্রথম কিস্তি একর প্রতি গোবর সার - ৪.০ টন অথবা খৈল - ২৪০কেজি ইউরিয়া - ৬৬ কেজি টিএসপি - ৮০ ,, এমপি - ৬০ ,, জিংকসালফ্ ৬ ,, জিপসপম - ৩৫-৪০ ,, বোরাক্স - ৬ ,,
২য়	▸ ১ম সেচ প্রদান।	▸ সাধারণত বীজআলু রোপণের ১০ম দিনে ১ম সেচ দেয়া হয়। জমিতে রসের অভাব না হলে এসময় সেচ দেবার দরকার হয় না।
৩য়	▸ জমিতে বীজআলুর অঙ্কুরোদ্গমের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ। ▸ ৩য় থেকে ৯ম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়টা রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের আলু উৎপাদনের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কালে ফসলে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং নিবিড় যত্ন নেয়া একান্ত অপরিহার্য।	
সপ্তাহ	পরিকল্পিত মাঠের কাজ	মন্তব্য

৪র্থ	▸ বীজআলু রোপণের ২৪-২৫ দিন অথবা চারাগাছে তিনটি পাতা হওয়ার পর থেকে পূর্ব পরিকল্পিত রুটিন মোতাবেক, প্রতি ৭-১০দিনে একবার করে ছত্রাক-বিনাশী ঔষধ 'মেনকোজেব ২০ ইসি' স্প্রে করা শুরু করতে হবে। ▸ ফসলের ২৭দিন বয়সে একর প্রতি এক কেজি হারে 'কুমুলাস/থিওভিট (সালফার)' স্প্রে করতে হবে।	▸ ফসলের ৬০দিন বয়স (৯ম সপ্তাহ) পর্যন্ত 'মেনকোজেব ২০ ইসি' স্প্রে করার রুটিন অব্যাহত রাখা হয়।
৫ম	▸ ফসলের বয়স ৩৫দিন হলে (৩৫-৪০ দিনের মধ্যে) পূর্ব নির্ধারিত মাত্রার অর্ধেক ইউরিয়া এবং অর্ধেক পটাশ সার সেচ নালায় ছিটিয়ে ('টপ ড্রেসিং) দেয়া হয়। ▸ ২য় বার সেচ দেয়া ।	▸ 'টপ ড্রেসিং' : ইউরিয়া ৫৬ কেজি / একর পটাশ ৬০ ,, / ,, ▸ সার দেবার পরে সেদিনই (৩৫-৪০ দিনের মধ্যে) সেচ-নালার মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আলগা করে আলুর সারির ওপর তুলে দিতে হবে, নইলে ইউরিয়া সার 'গ্যাস' আকারে উড়ে গিয়ে অপচয় হয়। ▸ আলুর সারিতে মাটি তুলে দেবার কাজ শেষ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিমিত মাত্রায় সেচ দিতে হবে। তাতে গাছ সহজেই মাটি থেকে পানির সাথে সার গ্রহণ করতে পারবে। বেশি পানি দিলে সার পানির সাথে দ্রুত নীচে নেমে অপচয় হবে।
৬ষ্ঠ	▸ আলু গাছের গোড়া থেকে কোনো কারণে মাটি সরে গেলে সারিতে মাটি তুলে দিতে হবে।	
৭ম	▸ ৩৫-৬০ দিন বয়সের ফসল নিয়মিত নজরদারিতে রেখে রোগাক্রান্ত অথবা অন্য কোনো রকম অনাকাঙ্খিত গাছ দেখা মাত্র তুলে ফেলতে হবে। এ কাজটাকেই 'রোগিং' বলা হয় - উন্নতমানের ফসল উৎপাদনের জন্য যা একান্ত জরুরি।	
৮ম	▸ আবহাওয়ার প্রতিকুলতা কিংবা অন্যকোনো কারণে পূর্ববর্তী সপ্তাহের কোনো কাজ বাকি থাকলে এ সপ্তাহে সেগুলি শেষ করা হয়।	
৯ম	▸ ৬০-৬৫ দিন বয়সের ফসলে ৩য় বার সেচ দেয়া হয়।	▸ পরিমিত পরিমানে সেচ দিতে হয়, যেন জমিতে জলাবদ্ধতা না হয়।
১০ম	▸ জমির মাটি আগাছামুক্ত রাখা এবং আলগা করে সারিতে তুলে দেয়াই এসময়ের প্রধান কাজ।	▸ গাছের গোড়ার মাটি সরে গেলে বা আলুগুলি মাটিতে ঢাকা না থাকলে সঠিক ভাবে বাড়ে না এবং আলু সবুজ হয়ে যায়, যাতে ফলণ হ্রাস এবং মানের অবনতি ঘটে।
১১	▸ জমির মাটি বেশি শুকিয়ে গেছে মনে হলে এসময় একটি বাড়তি সেচ দেয়া হয়।	▸ আলুর সারি আলগা ('লুজ') করে রাখা দরকার, যাতে আলুগুলি সহজেই বড় হতে পারে। ▸ গাছের মরা পাতা/ডগা বেছে ফেলতে হবে, যাতে রোগ বা পোকামাকড় সংক্রমণের আশঙ্কা কমে যায় এবং গাছগুলি প্রচুর পরিমানে আলো-বাতাস পেয়ে সতেজ থাকতে পারে।

সপ্তাহ	পরিকল্পিত মাঠের কাজ	মন্তব্য
১২	▸ জমি পর্যবেক্ষণ চলতে থাকে। রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের আলু পাওয়া যাবে কিনা, সে বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	▸ কেবলমাত্র বাছাইকৃত জমিগুলিতেই পরবর্তী কার্যক্রম চালানো হয়। ▸ কোনো রকম সংশয়যুক্ত জমির আলু রপ্তানি করা উচিৎ নয়।
১৩	▸ ফসলের অবস্থা সবদিক থেকে ঠিকঠাক থাকলে ৮০-৮৫দিন বয়সে 'হ্যাম পুলিং' করা হয়। ▸ আলু ফসল তোলার কম পক্ষে ৭-১০ দিন আগে এমন ভাবে সাবধানে টেনে গাছ উপড়ে ফেলাকে 'হ্যাম পুলিং' করা বলে, যাতে আলুগুলি মাটির উপরে উঠে না আসে।	▸ 'হ্যাম পুলিং' করার সময় যদি কোনো আলু মাটির উপরে উঠে আসে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ▸ রপ্তানিযোগ্য অক্ষত এবং অধিক সংরক্ষণশীল আলু উৎপাদনের জন্য যথাযথ নিয়ম মেনে 'হ্যাম পুলিং' করা একান্ত দরকার।
১৪	▸ 'হ্যাম পুলিং' করার ৭-১০ দিনের মধ্যে মাটির নীচে 'কিউরিং' শেষ হলো কিনা পরীক্ষা করে জমি থেকে আলু তুলতে হবে। ▸ আলু তোলার পর মাঠেই প্রাথমিক 'গ্রেডিং' করা হয়। ▸ কেবলমাত্র ১০০গ্রাম এবং বেশি ওজনের আলুগুলিই রপ্তানির জন্য বেছে নেয়া হয়। ▸ প্রথমিক গ্রেডিং করা আলুগুলি ৮০কেজি ব্যাগে ভরে চুড়ান্ত বাছাই ও প্যাকিং করার জন্য কোম্পানির নিজস্ব কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়।	▸ <u>মাটির নীচে 'কিউরিং' সমাপ্তির পরীক্ষার নিয়ম</u> মাটির নীচ থেকে ২-৩টি আলু তুলে হাতের বুড়ো আঙ্গুলে চাপ দিলে অথবা চটের বস্তায় আনুমানিক পাঁচ কেজি আলু নিয়ে ঝাঁকালে যদি আলুর ছাল উঠে না যায়, তাহলেই বুঝতে হবে 'কিউরিং' শেষ হয়েছে। ▸ কোম্পানির নিজস্ব কেন্দ্রে ওজন-আকার এবং চোখে দেখা মানের ভিত্তিতে রফতানি-পূর্ব চুড়ান্ত 'গ্রেডিং' করা হয়। ▸ চুড়ান্ত বাছাই করা (প্রতিটি ১০০গ্রাম ওজনের এবং অক্ষত) আলুগুলি রফতানির জন্য নির্ধারিত ১০কেজি পরিমাপের জালি-ব্যাগে প্যাকিং করা হয়।
১৫	▸ রপ্তানিযোগ্য আলুর ১০কেজি প্যাকেটগুলি নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুসারে কন্টেইনারে করে রপ্তানির জন্য বন্দরের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়।	▸ আলুর বাকি প্যাকেটগুলি পরবর্তী সময়ে রপ্তারির জন্য উত্তম রূপে হিম-ঘরে সংরক্ষণ করা হয়।

* আবহাওয়া বা অন্য কারণে যদি কোনো কাজ নির্দিষ্ট দিনে করা না যায়, তাহলে যত সত্বর সম্ভব সেই কাজ সম্পন্ন করা হয়।

* রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের আলু উৎপাদনের ক্ষেতে করণীয় সপ্তাহ-ওয়ারি কাজগুলি কেবলমাত্র একটি অনুসরণীয় 'রুটিন' আকারে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

* বাংলাদেশে আলু চাষের সাধারণ তথ্য এবং সপ্তাহ-ওয়ারি পরিকল্পিত তালিকায় উল্লেখিত বিভিন্ন কাজের বিশদ বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উল্লেখ করা হলো।

রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের জন্য

চাষের আগে করণীয় মাঠের বাইরের কাজ

(৪.১) প্রস্তুতিমূলক সাংগঠনিক কাজ

ক. এলাকা নির্বাচন ঃ ১০টি প্রধান বিবেচ্য দিক

☐ সমতল ভূমি বিশিষ্ট এলাকা

বিস্তির্ণ সমতল ভূমির অন্তর্গত জমি আলু চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। অসমতল এলাকার সংকীর্ণ সমতল জমিতেও সেচ-পানির অপচয় এবং জলাবদ্ধতার আশংকার কারণে আলু চাষ ভাল হয় না ॥

☐ আগ্রহী এবং স্বচ্ছল কৃষকবৃন্দ

এলাকার কৃষকরা আগ্রহী হলে তাদেরকে দিয়ে পরামর্শ মত উন্নত কৃষি-প্রযুক্তি অনুসরণ করানো সহজ হয়। অসচ্ছল কৃষকরা আগ্রহ থাকলেও উন্নত প্রযুক্তি অনুসরণের জন্য উচ্চ বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে পারে না ॥

☐ আলু উৎপাদনে অভিজ্ঞ কৃষক

আলু উৎপাদনের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে তারা সহজেই উন্নত প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং কারিগরী দিকগুলি বুঝতে পারে। তাদের পক্ষে উন্নত প্রযুক্তি অনুসরণ করা সহজ হয়।

☐ সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা

রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের আলু উৎপদনের জন্য নির্বাচিত এলাকায় সঠিক সময়ে সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং উৎপন্ন আলু পরিবহনের জন্য নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা একান্ত জরুরী। উত্তম সড়ক যোগাযোগের অভাবে নিয়মিত পরিদর্শনের কাজও বিঘ্নিত হয় ॥

☐ সেচ প্রদানের বন্দোবস্ত

উন্নতমানের আলু উৎপাদনের জন্য খরা বা অন্যকোনো কারণে জমি শুকিয়ে গেলে অবিলম্বে পর্যাপ্ত সেচ দিতেই হবে। সেচ না দিলে বা দিতে দেরী হলে আলুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফলণ কমে যায় এমনকি উৎপন্ন আলুর মানও খারাপ হয়। সুতরাং আলু উৎপাদনের ব্লক এলাকায় পানি সেচের জন্য গভীর কিংবা অগভীর নলকূপ অবশ্যই থাকতে হবে ॥

খাল-বিল-নদী-নালার খোলা পানি সেচ দিলে আলু ফসলে 'রাইজোক্টোনিয়া'সহ বিভিন্ন রোগজীবাণুর ব্যাপক আক্রমণ দেখা দিতে পারে।

☐ পানি নিকাশের উপযুক্ত সুবিধা

একটানা ২৪ঘন্টা জলাবদ্ধ থাকলে আলু ফসলে পঁচন ধরে ।

অসময়ে অতি-বৃষ্টি কিংবা অন্য কোনো কারণে জমিতে পানি জমে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পানি সরিয়ে না দিলে আলু ফসল পঁচে যায়। সুতরাং রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদন ব্লকের সকল জমিতেই উপযুক্ত পানি-নিকাশী ব্যবস্থা থাকতে হবে ॥

☐ এলাকায় প্রচলিত শস্য-পর্যায়ে আলু অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাব্যতা

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকগণ স্থানীয় প্রাকৃতিক ও ভৌত পরিবেশের সুবিধা-অসুবিধা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন রকমের শস্য-পর্যায় অনুসরণ করে থাকেন। এ বিষয়ে কৃষকরা হঠাৎ কোনো পরিবর্তনের ঝুঁকি নিতে চান না। সুতরাং প্রচলিত শস্য-পর্যায় এবং আলু আবাদের সময়ভিত্তিক সম্ভাব্য প্রতিযোগী ফসলের লাভ-লোকসান বিবেচনায় রেখেই বিভিন্ন এলাকায় আলু উৎপাদনের ব্লক নির্বাচন করতে হবে ॥

বিভিন্ন অবস্থান এবং পরিবেশের জমির জন্য
আলুর কয়েকটি উত্তম শস্য-পর্যায়

১. বোরো /ব্রাউশ → সবুজ সার + স্বল্পমেয়াদি সব্জি → আলু

২. বোরো/ব্রাউশ → রোপা আমন (স্বল্প-মেয়াদি) → আলু

৩. আলু → বাদাম → পতিত (চরাঞ্চলে)

৪. পাট/ বোনা আউশ → রোপা আমন → আলু

৫. খরিফ মৌসুমের ডাল → সয়াবিন/রোপা আমন → আলু

* বাদাম ফসলে 'সিওডোমোনাস' এবং পাটের জমিতে 'রাইজোক্টোনিয়া' রোগ দেখা দিলে সেই জমিতে আলু করা উচিৎ নয়।

☐ আলু উৎপাদনের জন্য অনুকুল স্থানীয় আবহাওয়া এবং পরিবেশ

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় আবহাওয়া এবং কৃষি-পরিবেশের কম-বেশি ভিন্নতা দেখা যায়। তাই সবখানে সকল প্রকার ফসল উৎপাদনে সফলতা লাভ করা যায় না। আলুর মত বিশেষ সংবেদনশীল ফসল উৎপাদনে আবহাওয়া এবং পরিবেশগত ঝুঁকির আশংকা থাকে অনেক বেশি। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে, যে সকল এলাকায় আশ্বিন-কার্তিক মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয় কিংবা অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে প্রচন্ড খরা দেখা দেয়, সেখানে আলুর চাষ লাভজনক হয় না। সম্পূর্ণ বেলে কিংবা অতিরিক্ত আঁঠালো মাটিও আলুচাষের উপযোগী নয়। অধিক লবণাক্ত মাটিতেও আলু ভালো হয় না। এ ধরণের সব বিষয়াদি বিবেচনায় রেখেই রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের ব্লক নির্বাচন করা উচিৎ॥

তুলণামূলক দীর্ঘ শীতকাল এবং তীব্রতর শীতের কারণে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল অধিকতর উপযোগী ॥

☐ এলাকার কয়েক বৎসরের কৃষি ইতিহাস - আলুর ক্ষতিকর রোগ-বালাই প্রকট নয়

দেশের কোনো কোনো এলাকায় বিভিন্ন কারণে নানাবিধ ফসলে অনেক রোগ বেশি দেখা যায়। সুতরাং উন্নতমানের বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে সফলতার জন্য স্থানীয় কৃষি-পরিবেশগত ইতিহাস সম্পর্কে অবশ্যই আগাম খোঁজখবর নিতে হবে। যেসব এলাকায় আলু ফসলে প্রতি বছরই অতিরিক্ত রোগ দেখা দেয়, সেসব এলাকা রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের জন্য নির্বাচন করা ঠিক নয় ॥

☐ কার্তিক মাসের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে (অক্টোবর, ৪র্থ সপ্তাহ- নভেম্বর, ১ম সপ্তাহ) আলু বীজ বপন করার সম্ভাব্যতা

আগাম মৌসুমের অনুকুল আবহাওয়ায় উৎপাদন করা হলে আলুর আকার বড় এবং মান উন্নত হয়, মূল্যও বেশি পাওয়া যায়। বিশেষত, আগাম মৌসুমের আলু ফসল জাব-পোকা এবং জাব-পোকাবাহিত ভাইরাসের আক্রমণ এড়াতে পারে। সুতরাং কৃষি এবং পরিবেশগত সকল দিক বিবেচনা করে এমন এলাকাতেই ব্লক নির্বাচন করা সঙ্গত, যেখানে কার্তিক মাসের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই বীজআলু রোপণ করা যায় ॥

খ. কৃষক নির্বাচন ঃ মৌলিক বিবেচ্য বিষয়াদি

☐ স্থানীয় কৃষকদের আলু উৎপাদনের অভিজ্ঞতা

আলু উৎপাদনের পূর্ব-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কৃষকরা সহজেই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত পরামর্শের গুরুত্ব বুঝতে এবং অনুসরণ করতে পারেন। নির্বাচিত ব্লকের কিছু সংখ্যক কৃষক অভিজ্ঞ হলেও বাকিদেরকে দিয়ে প্রত্যাশা মত কাজ করানো যেতে পারে। কিন্তু সবাই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হলে, এমন কৃষক গ্রুপ নিয়ে রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের আলু উৎপাদন করা অসম্ভব না হলেও খুবই ঝুঁকি পূর্ণ হতে পারে ॥

☐ কৃষকদের আগ্রহ এবং সম্মতি

কৃষিকাজে যেকোনো রকমের উন্নত এবং নতুন প্রযুক্তি অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কৃষকদের আগ্রহ এবং সম্মতি থাকা একান্ত দরকার। অনাগ্রহী কৃষকদের দিয়ে প্রত্যাশিত কাজ করানো অসম্ভব। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাক-প্রস্তুতির সময় নতুন প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং সম্ভাব্য লাভের দিকগুলি যৌথ আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলে কৃষকদের মধ্যে কার্যকর আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব ॥

☐ কৃষকের স্বচ্ছলতা

চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে অভিজ্ঞজনেরা বলেন, কৃষকের সচ্ছলতার দিকটা প্রকল্পের সাফল্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অসচ্ছল কৃষকের পক্ষে বাড়তি মূলধন বিনিয়োগ করা কিংবা কোনো প্রকার ঝুঁকি নেয়া সম্ভব হয় না। মূলত কারণেই অসচ্ছল কৃষকেরা যথেষ্ট রক্ষণশীল হয়ে থাকে। তাছাড়া, অসচ্ছল কৃষকদের জমি কম থাকায় ব্লক গঠণের জন্য তূলণামূলকভাবে অধিক সংখ্যক কৃষককে নিতে হয় বলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার কাজগুলি অধিকতর জটিল হয়ে পড়ে ॥

> প্রকল্পের ঝুঁকি কমানো এবং সহজ ব্যবস্থাপনার জন্যই তূলণামূলক সচ্ছল কৃষক বাছাই করতে হবে ॥

☐ জমি নির্বাচন

চুড়ান্তরূপে এলাকা নির্ধারণ করার পরই স্থানীয় কৃষকদের সাথে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আগ্রহী কৃষকদের জমি বাছাই করতে হবে। জমি বাছাইয়ের সময় কয়েকটি দিকের প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবে :

- আলু উৎপাদনের উপযোগিতা
- নির্বাচিত কৃষকের তূলণামূলক বড় আয়তনের জমি
- নির্বাচিত জমিগুলির পাশাপাশি অবস্থান, যাতে সুসংবদ্ধ (কম্প্যাক্ট) ব্লক প্রতিষ্ঠা করা যায়
- ব্লকের ভেতরের সকল জমিতেই আলু , বিশেষত একই জাতের আলু চাষ করা উত্তম ॥

☐ চুক্তি সম্পাদন

রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের আলু উৎপাদনের জন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষের জন্য সন্তোষজনক এলাকা/ব্লক ও কৃষক নির্বাচনের পরে যত সত্বর সম্ভব কোম্পানির উদ্যোগে মনোনীত কৃষকদের সাথে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। দেশজুড়ে একদিকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোম্পানির সংখ্যা বাড়ছে, ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা তীব্রতর হচ্ছে অপরদিকে কৃষকরাও নানা প্রলোভন-প্ররোচনার মুখে পড়ছে। তাই লিখিত চুক্তি না থাকলে কোম্পানি এবং কৃষকদের সম্পর্কেও মাঝে নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। স্বাক্ষরের আগেই ব্লকের সকল/অধিকাংশ কৃষকের উপস্থিতিতে কোম্পানির পক্ষ থেকে চুক্তির সকল শর্ত উপস্থাপন এবং আলোচনা করতে হবে, যাতে কোনো পর্যায়েই পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির কোনো সুযোগ না থাকে ॥

> ◀ ▶ সংশ্লিষ্ট সকল শর্ত চুক্তিপত্রে অবশ্যই লিখিত থাকবে ॥
>
> ◀ ▶ স্বাক্ষরিত চুক্তির সকল শর্তই উভয় পক্ষ সমভাবে মেনে চলবে ॥

☐ চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের সাথে যৌথ আলোচনা

চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই ব্লকের সকল কৃষকদেরকে নিয়ে যৌথ আলোচনাকে রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের আলু উৎপাদনের প্রাক-প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমসমুহের চুড়ান্ত পর্যায় বলা যেতে পারে। সকল কৃষকের একত্র উপস্থিতিতে আলোচনা করা হলে 'ব্যক্তি কৃষক' পর্যায়ের সকল প্রশ্ন এবং সংশয় দূর করে তাদেরকে একটি যৌথ কার্যক্রমের অংশীদার হিসাবে যুক্ত করা সম্ভব হবে। এতে কৃষকরা ব্যক্তিগত অবস্থানে থেকেই দলবদ্ধ সহযোগিতা এবং ইতিবাচক প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ হবেন ॥

☐ প্রত্যেক কৃষক সরাসরি জানবেন, তিনি একা নন, তাঁরা অনেকে মিলে রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদন করছেন। এমন প্রত্যক্ষ ধারণায় তাঁরা সমবেতভাবে অনুপ্রাণিত হবেন ॥

(৪.২) প্রস্তুতিমূলক কৃষি সংক্রান্ত কাজ

ক. রপ্তানিযোগ্য আলুর জাত(সমুহের) নাম-পরিচয়

বাংলাদেশে উন্নতমানের যেসব আলুর জাত আবাদ করা হয় তার সবগুলিই বিদেশী জাত। বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন সময় নানা জাতের আলুর বীজ আনা হয়েছে, তাদের কোনো কোনোটি এখন আর আবাদ করা হয় না। কিন্তু হল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত বেশ কয়েকটি জাত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খুবই সফল প্রমানিত হওয়ায় বিশেষ জনপ্রিয় জাত হিসাবে আবাদে টিঁকে আছে।

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে আবাদ করা হয়, এমন কয়েকটি বিদেশী আলুর জাত হচ্ছে :

- 'ডায়মন্ট',
- 'কার্ডিনাল',
- গ্রানুলা,
- 'এস্টেরিকস্'
- পেট্রোনিজ',

রপ্তানি বাজারে সর্বাধিক চাহিদা রয়েছে **গ্রানুলা** জাতের। অবশ্য কিছু পরিমানে **ডায়মন্ট** জাতের আলুও রপ্তানি করা হয়। গ্রানোলা এবং ডায়মন্ট - দু'টিই 'সাদা' জাতের আলু হিসাবে পরিচিত।

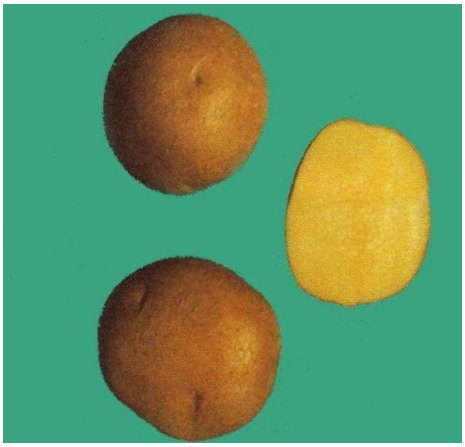

◀ **'গ্রানুলা'** ও **'ডায়মন্ট'** ▶ জাতের আলু

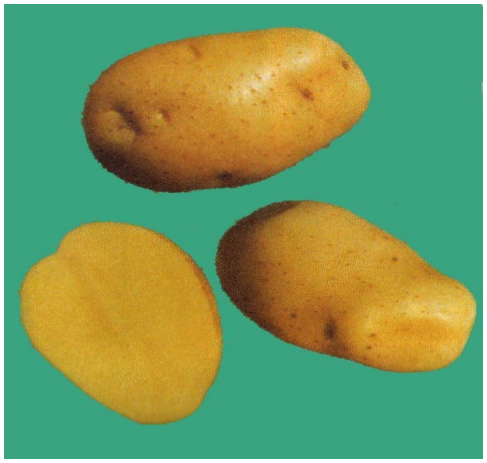

'গ্রানুলা' এবং 'ডায়মন্ট' - দু'টি জাতই উচ্চ ফলণশীল এবং আবাদ ও ব্যবহারিক পর্যায়ে নানা প্রকার আকর্ষণীয় গুণসমৃদ্ধ।

খ. গ্রানুলা জাতের পরিচিতি :

☐ গাছ মাঝারি উচ্চতার, ৫০-৬০ সেঃমিঃ পর্যন্ত হয়ে থাকে। ☐ পাতা ও কান্ড হালকা সবুজ বর্ণের। ☐ পাতা আংশিক ছড়ানো। ☐ আলু (টিউবার) গোল থেকে ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট। রঙ বাদামি হলুদ, খোসা অমসৃণ এবং ভিতরের শাঁস হলুদাভ রঙের। ☐ জীবনকাল ৯০-৯৫দিন। ফলণ হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ টন অর্থাৎ একর প্রতি ১০-১২ টন বা প্রায় ৩০০ মণ। ☐ গ্রানুলা জাতের আলু প্রাকৃতিক / স্বাভাবিক অবস্থায় দীর্ঘ সময় সংরক্ষণযোগ্য ।

গ. ডায়মন্ট জাতের পরিচিতি

☐ গাছ দ্রুত বর্ধণশীল, সবল এবং কান্ডবহুল। ☐ ডালপালা কিছুটা দেরিতে আসে। ☐ পাতা বেশ বড়, ডিম্বাকার, আগার দিকে সরু, রঙ হালকা সবুজ। ☐ আলু ('টিউবার') আকারে বেশ বড়, ডিম্বাকৃতি এবং অগভীর চোখ বিশিষ্ট । ☐ আলুর খোসার রঙ সাদাটে-বাদামি, শাঁস হলুদাভ, খেতে সুস্বাদু। ☐ ডায়মন্ট আলুর জীবনকাল ৮৫-৯০দিন। ☐ ফলণ ২৫-৩০টন বা উত্তম ব্যবস্থাপনায় আরো বেশি হতে পারে।

- বাংলাদেশে উফশী আলুর মধ্যে ডায়মন্ট জাতের আলুই বেশি আবাদ করা হয়।
- গড় ফলণের দিক থেকে গ্রানুলা এবং ডায়মন্ট সমতূল্য ।

☐ রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে গ্রানুলা ও ডায়মন্ট জাতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে ।

'গ্রানোলা' আলুর গাছ ↑

* গ্রানোলা জাতের আলু ফসলে রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ ঘটে খুবই কম ॥
* রোগ-বালাই কম হওয়ায় গ্রানোলা আলুকে একটি নিরাপদ জাত হিসাবে বিবেচনা করা হয় ॥
* রোগবালাই দমনে খরচ কম লাগে বলে উৎপাদনকারীরা অধিক লাভবান হতে পারেন ॥
* প্রাকৃতিক অবস্থায় দীর্ঘ সময় সংরক্ষণযোগ্য ॥

'ডায়মন্ট' আলুর গাছ ↓

* আলু তূলণামূলক ভাবে বড় আকারের হয়ে থাকে ॥
*চোখ অগভীর, আলু মসৃণ এবং দেখতে ভালো ॥
* আলু অধিকতর সুস্বাদু ॥

রপ্তানিযোগ্য আলু হতে হবে আমদানিকারকের চাহিদামত সঠিক জাতের এবং যথার্থ উন্নতমানের ॥

☐ বীজ সংগ্রহ : মূল বিবেচ্য

- রপ্তানি বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট জাতের বীজআলু সংগ্রহ করতে হবে ।
- বিশ্বস্ত এবং সুখ্যাতিসম্পন্ন উৎস থেকে বীজআলু সংগ্রহ করতে হবে ।
- ব্যবহৃত বীজের গুণমানের ওপরই ফলণের পরিমান এবং আলুর মান নির্ভর করে ।

ঘ. বীজ-আলুর গুণমান

- বীজআলুর ত্বক (খোসা/চামড়া) অক্ষত থাকবে। কোনো রূপ পচণ বা রোগাক্রান্ত দাগ থাকবে না।
- উন্নতমানের ফসলের জন্য 'আস্ত' বীজআলু রোপন করা ভাল । বিশেষ করে আগাম আবাদের জন্য আস্ত বীজআলুই লাগাতে হবে। কারণ, এ সময় অধিক বৃষ্টিপাতে মাটি বেশি ভিজা থাকলে টুকরা করা বীজআলু পঁচে যেতে পারে।

তবে বীজআলুর আকার বেশি বড় হলে 'আস্ত' লাগাতে খরচ বেশি পড়ে। তাই বড় আকারের বীজআলু নির্দিষ্ট নিয়মে, খুব ধারালো দা/চাকু দিয়ে২-৩ টুকরা করে কেটে লাগাবার পরামর্শ দেয়া হয় । বীজআলু কাটার সময়, জীবাণুর সংক্রমণ রোধ করার জন্য কিছুক্ষন পরপর দা/চাকু সেভলন বা ডেটল দিয়ে শোধন করে নিতে হবে।

- রোপনের জন্য প্রতিটি বীজআলু বা টুকরাতে অন্তত ২-৩টি সুস্থ-সজীব চোখ থাকা দরকার।
- আকার এবং ওজনের ভিত্তিতে বীজআলুকে বিভিন্ন 'গ্রেড' বা শ্রেণীভূক্ত করা হয়।

'এ' এবং 'বি' গ্রেডভুক্ত আস্ত বীজআলু রোপণের হার হচ্ছে :

বীজআলুর 'গ্রেড'	বীজ রোপণের পরিমান (কেজি)		
	বিঘায়	একরে	'বি' গ্রেডের আলু 'এ' গ্রেড অপেক্ষা আকারে বড় বিধায় বপনে অধিক লাগে ॥
এ	২১৪	৬৪০	
বি	২৪০	৭২০	

☐ বীজআলু প্রস্তুতকরণ এবং শোধণ

- আলু ফসলের মাঠ-জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, তাই বপণের পূর্বে বীজ অঙ্কুরিত করা হলে জমিতে আলু ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশ দ্রুত হতে পারে।
- আলু অত্যন্ত সংবেদনশীল ফসল, সহজেই নানা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। রোপণের পূর্বে বীজআলু শোধন করে নিলে, প্রথম দিকে অনেক রোগের ঝুঁকি কমে যায় ।

বীজআলু প্রস্তুতকরণ

- হিমাগারে সংরক্ষিত বীজআলু, শীতল কক্ষ থেকে বের করার পর প্রায় ৪৮ ঘন্টা 'প্রিহিটিং' (১২-১৫ ডিগ্রি সেঃ)এ রাখতে হবে ॥
- তারপর বের করে, বীজআলুতে শীর্ষাঙ্কুর থাকলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে ॥
- অতঃপর আধো আলোআঁধার যুক্ত স্থানে, স্বাভাবিক তাপে অঙ্কুরোদ্গম হওয়া পর্যন্ত রেখে দিতে হবে ॥
- প্রাক-অঙ্কুরিত বীজ নিয়ে মাঠে রোপণ করতে হবে ॥

রোপনের আগে প্রাক অঙ্কুরণ

ঙ. বীজআলু সরবরাহ

- হিমাগার থেকে বীজআলু বের করে ৭২ ঘন্টা 'প্রি-হিটিং' সম্পন্ন করে ২৪ ঘন্টা ব্যাপী 'ফ্যানিং' (বাতাস লাগানো) হয়।
- চূড়ান্তরূপে বাছাই এবং 'গ্রেডিং' করা হয়।
- রোপণের উপযুক্ত বাছাইকৃত এবং শোধিত বীজআলু চটের বস্তাবন্দী অবস্থায় কৃষকদের কাছে সরবরাহ করা হয়।
- চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ই, উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সরবরাহকৃত বীজআলু এবং ফসল উঠার পরে আলু সংগ্রহের মূল্য নির্ধারিত করা হয়। আলু সংগ্রহের সময়, পূর্বে বাকিতে প্রদত্ত বীজের মূল্য এবং 'সুরভী'র প্রদত্ত ঋণ ও অন্যান্য উপকরণের মূল্য সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

রপ্তানিযোগ্য আলু চাষে মাঠের কাজ

ক. আলুবীজ বপনের সময় :

বাংলাদেশে সাধারণভাবে কাতিক মাসের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়নের মাঝামাঝি পর্যন্ত (নভেম্বর মাস) আলুবীজ বপনের উপযুক্ত সময়। তবে অনেক কৃষক, নিজের জমির জন্য উপযুক্ত ফসল-চক্রের কথা বিবেচনায় রেখে, এর পরেও বীজ বপন করে থাকেন। বাংলাদেশে শীতকাল মোটামুটি তিন মাস স্থায়ি, তাই দেরীতে বীজ রেপন করলে ফসলের পরিপূর্ণ বৃদ্ধি সম্ভব হয় না, তাই আলুর ফলণ কমে যায়। তাছাড়া, মৌসুমের শেষ দিকে প্রচুর জাবপোকার আক্রমন ঘটতে পারে বলে জমিতে ভাইরাস আক্রমণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতির আশংকা অনেক বেশি থাকে।

সকল প্রকার ক্ষতির আশংকা এড়িয়ে উন্নতমানের আলু উৎপাদনের জন্য কার্তিক মাসের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই (অক্টোবর, ৪র্থ সপ্তাহ- নভেম্বর, ১ম সপ্তাহ) আলু বীজ বপন করা উত্তম।

খ. জমি প্রস্তুতকরণ

- আলু চাষের জন্য নির্বাচিত জমি থেকে পূর্ববর্তী ফসল তোলার পরে যদি যথেষ্ট সময় থকে, তাহলে দু'তিনটি চাষ দিয়ে জমির মাটি কিছুটা উল্টে-পাল্টে রাখতে পারলে ভালো হয়।
  এতে করে জমিতে আগাছা কম হবে, ক্ষতিকর পোকামাকড় ডিমসহ নষ্ট হয়ে যাবে এবং পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ এবং আগাছা পচে জমিতে জৈবসার যুক্ত হবে।
- আলু রোপণের আগে জমিতে জো আসার সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল, পাওয়ার টিলার বা ট্রাক্টর দিয়ে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। মাটি ঝুরঝুরে হলে আলুর আকার সুন্দর ও বড় হতে পারে, ফলণও বৃদ্ধি পায়।

> যথাসম্ভব ঝুরঝুরে মাটি ও পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ আলু উৎপাদনে সফলতার অন্যতম প্রধান শর্ত ॥ নির্বাচিত ব্লকের ৩০ মিটারের মধ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 'খাবার আলু' বা 'সালানেসি' পরিবারের অন্য কোনো ফসল আবাদ করা চলবে না ॥

- মাটির ঢেলাগুলি অবশ্যই ভেঙ্গে দিতে হবে। মাটিতে ঢেলা থাকলে আলু বড় হতে পারে না এবং আকার অসম ও বিকৃত হয়ে যায় ।
- জমি প্রস্তুত করার সময় অবশ্যই পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ এবং জমির ও আইলের পার্শ্ববর্তী আবর্জনা ও আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।
- আলুর জমি অবশ্যই সম্পূর্ণ সমতল করে তৈরি করতে হবে । অসমতল জমিতে সার ও সেচের পানির অপচয় ঘটে এবং কখনো কখনো জমির কোনো কোনো অংশে জলাবদ্ধতাও দেখা দিতে পারে।

সার প্রয়োগ

- স্বল্প সময়ে আলু ফসলের পরিপূর্ণ দৈহিক বিকাশের প্রয়োজন বলে সঠিক সময়ে সুষম সার প্রয়োগ করা একান্ত জরুরী।

> জমির মাটি পরীক্ষা করিয়ে সার প্রয়োগের সঠিক পরিমান নির্ধারণ করা উচিৎ ॥

- ফসলের প্রকৃতি এবং চাহিদার কথা বিবেচনা করে আলু ফসলে জৈব এবং রাসায়নিক - উভয় প্রকারের সারই দেয়া হয়।
- সাধারণত গোবর বা অন্য প্রকারের জৈব সার চাষের সারা জমিতে ছড়িয়ে দেয়া হয়। মিহি করা খৈল বা এজাতীয় সার শেষ চাষের আগে ছিটিয়ে দেয়া ভালো।
- জমিতে ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি থাকলে শেষ চাষের আগে 'ম্যাগনেসিয়াম সালফেট' ছিটিয়ে দিতে হবে।
- জিংক সালফেট, জিপসাম এবং বোরাক্স ইত্যাদি সারও শেষ চাষের সময় ছিটিয়ে দিতে হয়।
- নির্ধারিত পরিমানের অর্ধেক ইউরিয়া এবং অর্ধেক পটাশ এবং সবটুকু ফসফেট সার বীজ রোপনের সময় নালায় দিতে হবে।
- নালায় প্রয়োগ করলে সারের অপচয় কম হয়। শিকড়ের কাছাকাছি থাকায় সবটুকু সারই গাছের কাজে লাগে ।

আলুর জমিতে সার প্রয়োগের একটি সাধারণ ‘নমুনা’ ছক

সারের নাম	পরিমাণ		প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতি	
	বিঘায়	একরে	প্রাথমিক প্রয়োগ	পরবর্তী প্রয়োগ
গোবর (অথবা)	১৩৪০	৪০০০	জমি তৈরির সময় ছিটিয়ে	X
খৈল	৮০	২৪০	,,	X
ইউরিয়া	৩৮	১১২	৫০% সার বীজ রোপণের সময় নালায় প্রয়োগ	ফসলের বয়স ৩৫-৪০দিন হলে ৫০% ইউরিয়া ৫০% পটাশ সারের সাথে মিশিয়ে নালায় দিয়ে নালার মাটি কুপিয়ে আলগা করে সারিতে তুলে দিতে হবে।
টিএসপি	২৫	৮০	সবটুকু সার নালায় প্রয়োগ	X
এমপি	৩৮	১২০	৫০% ,, ,, ,,	ফসলের বয়স ৩৫-৪০দিন হলে ৫০% ইউরিয়া ৫০% পটাশ সার একত্রে প্রয়োগ।
জিংক সালফেট	২	৬		জমি তৈরির সময় ছিটিয়ে
জিপসাম	১২	৩৫-৪০		,,
বোরাক্স	২	৬		,,
ম্যাগ. সালফেট	১৪	৪০		,,

আলুর জমিতে নালা/কেইল তৈরি করে

গ. বীজ রোপণ এবং প্রথম কিস্তির সার ও সেচ প্রয়োগ

- বীজআলু অবশ্যই ‘লাইন’ করে নালা / ‘কেইল’ তৈরি করে লাগাতে হবে।
- আলুর জমিতে বীজ রোপণ ও সার প্রয়োগের সবচেয়ে ভালো নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে ২.০ - ২.৫ ইঞ্চি (৫-৭ সেঃমিঃ) গভীর করে নালা টেনে বীজ রোপণের পরে বীজ লাইনের উভয় পাশে ৪.০ ইঞ্চি (১০সেমি) দূরে ৩-৪ইঞ্চি (৮-১০সেমি) গভীর নালা তৈরি করে, সুপারিশকৃত মাত্রার অর্ধেক ইউরিয়া, অর্ধেক এমপি এবং সম্পূর্ণ টিএসপি সার সেই নালাতে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

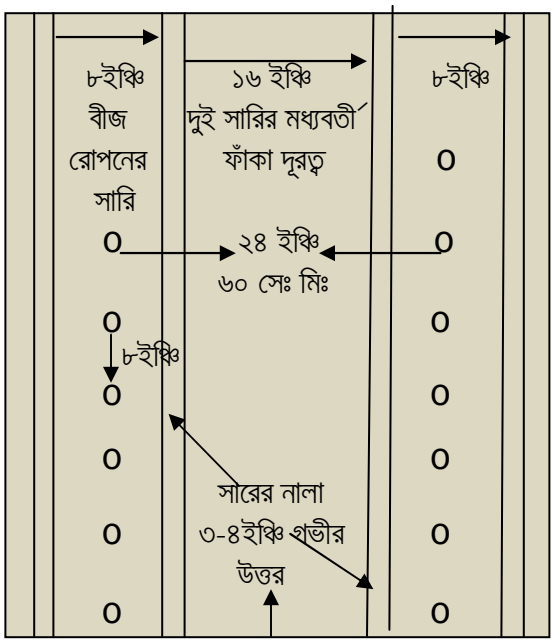

বীজআলু রোপণ ও সার প্রয়োগের নালার নক্শা

- নালায় সার প্রয়োগের ব্যাপারে দু’টি বিষয়ে খেয়াল রাখতেই হবে, যেন কোনো অবস্থাতেই সার বীজের গায়ে না লাগে আর গাছের গোড়ায় মাটি দেবার সময় যেন সার উপরে উঠে গাছের গোড়ায় না লাগে।
- রাসায়নিক সার শিকড়, কান্ড বা পাতায় লাগলে গাছের ক্ষতি হয় ।
- জমিতে রসের পরিমান কম থাকলে বীজ গজাতে দেরি হয় বা অসমভাবে গজায়। তাই মাটিতে রসের পরিমান বুঝে জমি চুড়ান্ত প্রস্তুতির আগেই হালকা সেচ দেয়া যেতে পারে।
- বীজ লাগানোর সাথে সাথে বীজ ঢেকে ‘ভেলি’ বেঁধে দিয়ে দু’টি ‘ভেলি’র মাঝখানে সৃষ্ট নালায় হালকা সেচ দিলেও বীজ গজানো এবং গাছের বৃদ্ধিতে সহায়তা হয় ।

- মাঠজুড়ে সব আলুর গাছ যেন সমভাবে রোদ পায়, তার জন্য বীজ রোপণের লাইনগুলি অবশ্যই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করে টানতে হবে ।
- রপ্তানি বাজারের চাহিদামত বড় আকারের আলু উৎপাদনের জন্য সারিতে ৮ইঞ্চি দূরে দূরে বীজ আলু রোপণ করা হয়।
- চাষ-মই দিয়ে প্রস্তুত করা জমিতে উত্তর-দক্ষিণে সূতলী ধরে, লাঙ্গল বা চিকন কোদাল দিয়ে ২-৩ইঞ্চি গভীর রোপণ নালা কাটতে হবে।
- রোপণ নালার মাঝ বরাবর কাঠি মেপে ৮ ইঞ্চি দূরে দূরে খাড়া ভাবে বীজ বসিয়ে হালকা মাটি চাপা দিতে হবে।
- মাটিতে বীজ বসানোর পরে, বীজের সারির দু'পাশে সারের নালা কেটে সেই মাটি বীজ-সারির উপরে তুলে দেয়া যায় ।
- বীজআলু রোপণের সময় খেয়াল করে আলুর সুস্থ-সজীব একাধিক 'চোখ' উপর-মুখী অবস্থায় রাখলে বীজ তাড়াতাড়ি গজাতে পারে এবং চারাগুলিও সহজেই মাটির উপরে উঠে আসতে পারে।

গ. আলু ফসলে সেচ প্রয়োগ

- আলু ফলণের পরিমান এবং উৎপন্ন ফসলের মান বিশেষভাবেই মাটিতে সঠিক পরিমানে রস থাকার ওপর নির্ভরশীল । পানির অভাব হলে আলুর ফলণ কমে যায় আবার অতিরিক্ত সেচ দিলেও ফলণের ক্ষতি হয়।
- আলু ফসল জমিতে দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। অতিরিক্ত সেচ দিলে 'রাইজোক্টনিয়া' রোগ দেখা দিতে পারে।
- মাটিতে রসের অবস্থা (পানির চাহিদা) বিবেচনা করে, বীজআলু রোপণের পর থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত ৪-৫ বার পরিমিত পরিমানে সেচ দেবার প্রয়োজন হয় ।
- জমিতে গাছের বয়স ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে থাকা সময়ে পূর্বোক্ত তালিকার অর্ধেক ইউরিয়া এবং অর্ধেক এমপি সার ছিটিয়ে দেবার পরেই একটি সেচ দেয়া দরকার, তাতে গাছের শিকড়ের কাছে সহজেই সার পৌঁছে যায় ।
- আলু রোপণের পর ১ম সেচ : কেইলের ১/২ অংশ ভিজিয়ে দিতে হবে।

২য় ও ৩য়	,, :	,,	২/৩	,,	,,	,,	,,	।
প্রয়োজন হলে ৪র্থ	,, :	,,	২/৩	,,	,,	,,	,,	।
শেষ বা ৫ম	,, :	,,	১/২	,,	,,	,,	,,	।

ফসলের ৩০-৩৫দিন বয়সে উপরি-সার দেবার পরেই একটি সেচ দিতে হবে ॥
ফসল তোলার অন্তত ১০-১২দিন আগেই সেচ দেয়া বন্ধ করতে হবে ॥

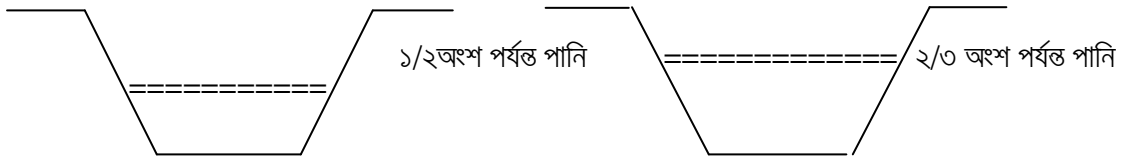

১ম ও শেষ সেচ — সেচ প্রয়োগের নকশা — ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সেচ

সুস্থ-সতেজ আলু উৎপাদনের জন্যও চাহিদামত পরিমিত সেচ প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ । অতিরিক্ত সেচ দিলে 'রাইজক্টোনিয়া সোলানি' নামক ছত্রাকের আক্রমন ঘটতে পারে । সেচ কম হলে আলুতে 'দাঁদ' এবং 'হলো হার্ট' জাতীয় রোগ হতে পারে।

ঘ. অন্তর্বর্তীকালীণ পরিচর্যা

- আলু একটি স্বল্পমেয়াদি অঙ্গজ ফসল। তাই আলু উৎপাদনে সফলতার জন্য ফসলের সুষ্ঠু এবং দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির জন্য ফসল পরিচর্যার কাজগুলি সঠিক নিয়মে এবং যথাযথ সময়ে করা খুবই জরুরী ।
- ফসলের ৩০-৩৫দিন বয়সে উপরোক্ত ছকের অর্ধেক ইউরিয়া এবং অর্ধেক এমপি সার দুই সারি আলুর মধ্যবর্তী নালায় মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে দিতে হবে।
- ঝুরঝুরে মাটিতে আলুর আকার বড় এবং গড়ণ সুন্দর হয়।
- সারমিশ্রিত কোপানো মাটি আলু গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন,
  - * কোপানোর সময় আলুর শিকড় বা 'স্টোলন' কাটা না পড়ে।
  - * মাটি তুলে দেবার সময় গাছের পাতা যেন ঢাকা না পড়ে।
- সারমিশ্রিত নালার মাটি কোপানো ও ভেলিতে তুলে দেবার সময় একই সাথে জমির আগাছা সম্পূর্ণ দূর করতে হবে।
- আগাছা আলু ফসলের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই প্রয়োজন মত নিয়মিতভাবেই আগাছা দূর করতে হবে। নিড়ি বা কোদাল দিয়ে আগাছা দূর করার সময় মাটি ঝুরঝুরে হয় বলে আলু ফসলের বাড়তি উপকার হয়।
- গাছের গোড়ায় সারমিশ্রিত মাটি তোলা শেষ করেই জমিতে একটি সেচ দিতে হবে।

রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের জন্য মনে রাখতেই হবে যে

আলু ফসল কখনো দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না।
আলুর জমিতে উপযুক্ত পানি-নিকাশী ব্যবস্থা রাখতেই হবে ।
পরিমিত পরিমান সেচে আলু আকারে বড় হয় এবং ফলণ বাড়ে।
কম সেচে ফলণ কমে যায়, অতিরিক্ত সেচে ফসলের ক্ষতি হয় ।
রপ্তানিযোগ্য আলু অবশ্যই দেখতে ভালো এবং বড় আকারের হওয়া দরকার।
রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের ব্যাপারে অন্তর্বর্তী পরিচর্যার কাজগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ॥

ঙ. 'রোগিং' ঃ সন্দেহযুক্ত গাছ বাছাই

- নির্বাচিত জাতের এবং বিশ্বস্ত উৎস থেকে সংগৃহীত বীজ দিয়ে আলু-ফসলের আবাদ করা হলেও, উৎপাদনকালীণ সময়ে ফসলের মাঠে বিভিন্ন কারণে কিছু কিছু গাছ সন্দেহযুক্ত মনে হতে পারে। এমন গাছগুলি তুলে ফেলাকে 'রোগিং' বলে ।

যেসব গাছ তুলে ফেলা দরকার

- রোগাক্রান্ত গাছ,
- অতিরিক্ত দুর্বল গাছ এবং
- দেখতে অন্য জাতের মত (জেনেটিক ডেভিয়েশন) গাছ ।

রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের আলু উৎপাদনের জন্য
'রোগিং' একটি অবশ্য করণীয় কাজ ॥

কেন তুলে ফেলা দরকার

- রোগাক্রান্ত গাছ থেকে সারা মাঠেই রোগ ছড়াবে,
- গাছগুলি মাটির 'রস' এবং পুষ্টি-উপাদানে ভাগ বসাবে, কিন্তু দুর্বল গাছে আলুর ফলণ কম হবে কিন্তু রপ্তানিযোগ্য মানসম্পন্ন 'বড়' আকারের হবে না এবং দেখতে রপ্তানি মানের চেয়ে খারাপ হতে পারে।

- আলুর চারা গজানোর পর থেকে ২-৪দিন পর পর নিয়মিত জমি পরিদর্শন করে, যখনই অনাকাঙ্খিত গাছ দেখা যাবে, তখনই তুলে ফেলতে হবে।
- যদি ফসল তোলার ঠিক আগে আগে এমন গাছ চোখে পড়ে, তাহলে সেগুলি আলুসহ উঠিয়ে, আলুগুলি আলাদাভাবে রাখতে হবে, যাতে রপ্তানীযোগ্য আলুর সাথে মিশে না যায়।

যত যত্নেই উৎপাদন করা হোক না কেন
জমি থেকে ফসল তোলার আগে-পরে সঠিক নিয়ম মেনে চলার উপরই রপ্তানিযোগ্য আলুর গুণ-মান নির্ভর করে।
আলু ফসল তোলার আগে-পরে ফসলের গুণ-মান উন্নত করার জন্য যে সকল কাজ করা হয়, সেগুলিকেই একত্রে 'প্রক্রিয়াজাতকরণ' বলা হয়।
রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'হ্যাম পুলিং' এবং 'কিউরিং' হচ্ছে প্রক্রিয়াজাতকরণের দু'টি অপরিহার্য কাজ।

'হ্যাম পুলিং'

- আলুর ফসল তোলার কমপক্ষে ৭-১০দিন আগে, গাছ উপড়ে ফেলাকে 'হ্যাম পুলিং' বলে ।
- সঠিক নিয়মে 'হ্যাম পুলিং' করলে আলুর খোসা শক্ত হয়, আলু তোলার সময় ক্ষত হওয়ার আশংকা কমে এবং সব মিলিয়ে আলুর সংরক্ষণ-ক্ষমতা বাড়ে ।
- 'হ্যাম পুলিং' করার সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হচ্ছে, হাত বা পা দিয়ে সাবধানে মাটি চেপে এমন ভাবে গাছ তুলে ফেলা, যাতে আলুগলি মাটির উপরে উঠে না আসে।
- 'হ্যাম পুলিং' করার সময় যদি কোনো আলু মাটির উপরে উঠে আসে, তাহলে মাটি তুলে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে। না হলে অনাবৃত আলুগুলি সবুজ হয়ে যাবে এবং সূতলী পোকার আক্রমণ ঘটতে পারে।
- উপড়ে ফেলা গাছগুলি অবশ্যই জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

রপ্তানিযোগ্য অক্ষত এবং অধিক সংরক্ষণশীল আলু উৎপাদনের জন্য যথাযথ নিয়মে 'হ্যাম পুলিং' করা দরকার ॥

চ. আলু তোলা এবং 'কিউরিং'

- গাছ উপড়ে ফেলা বা 'হ্যাম পুলিং' করার পরে ৭-১০দিন মাটির নীচে রেখে আলুর ত্বক শক্ত করাকে মাটির নীচে 'কিউরিং' বলে।
- আলু তোলার জন্য আরো ২/১দিন বেশি অপেক্ষা করা পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই 'হ্যাম পুলিং' করার ৭-৮দিনের আগে রপ্তানিযোগ্য আলু তোলা উচিৎ নয়।

আলু তোলার আগে 'কিউরিং' সম্পন্ন হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখুন

* মাটির নীচ থেকে ২-৩টি আলু উঠিয়ে হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে দেখুন ছাল উঠে যায় কিনা অথবা
* চটের বস্তায় ৫কেজি পরিমান আলু নিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখুন ছাল উঠে যায় কিনা

এভাবে পরীক্ষায় যদি ছাল উঠে না যায়, বুঝতে হবে ঠিকমত 'কিউরিং' সম্পন্ন হয়েছে ॥

- মেঘ-বৃষ্টি থেকে মুক্ত শুষ্ক এবং ঠান্ডা সকালে বা বিকালে আলু তোলা উত্তম।
- আলু তোলার পর মাঠে স্তূপ করে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছায়াযুক্ত খোলামেলা স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ।
- ছায়াময়, ঠান্ডা, শুকনা এবং বাতাস চলাচলযুক্ত স্থানে সর্বোচ্চ ১০-১২ ইঞ্চি উঁচু করে বিছিয়ে ৩-৪ দিন রেখে 'কিউরিং' করতে হবে।

রপ্তানিযোগ্য আলু তোলার পরে সঠিক ভাবে 'কিউরিং' করা হলে

*** আলুর খোসা শক্ত হয়** এবং *** ছোটোখাটো আঘাতের দাগ শুকিয়ে যায় ॥**

ছ. রপ্তানিযোগ্য আলু বাছাই এবং গ্রেডিং

- 'কিউরিং' করার পরে সুগঠিত সুন্দর আলুগুলি বেছে নিতে হবে।
- বাছাই করা লটে কোনো ক্ষত বা দাগযুক্ত কিংবা বিকৃত আকারের আলু থাকবে না।
- বলা চলে, বাছাই করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, আলুর লটের 'চোখে-দেখা-মান' উন্নয়ণ করা।
- রফতানি বাজারে তূলণামূলক বড় আকারের/ওজনের আলুর চাহিদা এবং দাম বেশি থাকে।
- আকার/ওজনের ভিত্তিতে আলুর পৃথক লট করাই গ্রেডিংএর মূল লক্ষ্য।
- রফতানিযোগ্য আলুর দু'টি গ্রেড হচ্ছে,

এ-গ্রেড : ৫-৭টি আলুর ওজন এক কেজি
বি-গ্রেড : ৭-৯টি ,, ,, ,, ,,

বাংলার লোকজ বচন
"আগে দর্শণধারী' পরে গুণ বিচারি" রপ্তানিযোগ্য আলু বাছাই এবং গ্রেডিং করার ক্ষেত্রে কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ॥

অবাছাইকৃত আলু

গ্রেডিং করা আলু

আলুর ফসল সংরক্ষণ

- ফসলের ফলণ বা মানের জন্য ক্ষতিকর রোগবালাই এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষার জন্য পরিকল্পিত বহুমুখী প্রচেষ্টাকেই সাধারণভাবে 'ফসল সংরক্ষণ' বলা হয় ॥

রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের আলু উৎপাদনের
*** জমি নিয়মিত দেখাশোনা করতে হবে ।**
*** রোগবালাই দেখামাত্র প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।**
***এলাকার কৃষি-ইতিহাস জেনে আবাদের সঠিক সময় বেছে নিয়েও পোকামাকড় এবং রোগবালাই এড়ানো যায়।**
*** সঠিক সময়ে সঠিক ঔষধ সঠিক নিয়মে ব্যবহার করাই সফলতার মূল কথা ।**

- রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের আলু ফসল সংরক্ষণের জন্য রোগ-বালাইয়ের প্রতিকার অপেক্ষা প্রতিরোধ করাই উত্তম॥
- প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকমের ঔষধ উপযুক্ত সময়ে সঠিক মাত্রায় এবং সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে।
- ফসল সংরক্ষণের কাজে খরচ কমানো এবং অধিক সফলতার জন্য ঔষধ নির্বাচন এবং ব্যবহার-বিধি সম্পর্কে স্থানীয় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ খুবই কাজে লাগে ॥
- রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের আলু উৎপাদনের জন্য মনে রাখা দরকার সঠিক সময় মেনে পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করলে রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয় ॥

আলু ফসলের কয়েকটি বিশেষ ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের পরিচিতি এবং দমন-পদ্ধতি

১. কাটুই পোকা ঃ

এগ্রেটিস ইপসিলন

বিবরণ ঃ

- কাটুই পোকার কীড়া বেশ শক্তিশালী ।
- পোকার পিঠের রঙ কালচে-বাদামি ।
- শরীরের রঙ ধূসর-সবুজ, পাশে কালো দাগ।
- শরীর নরম ও তৈলাক্ত ।

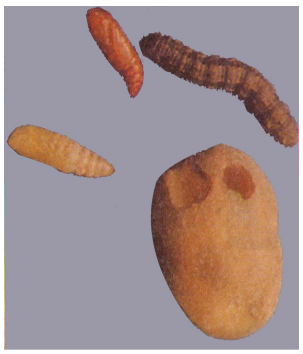

কাটুই পোকা ও আক্রান্ত আলু

আলুর কাটুই পোকার কাটা গাছ

ক্ষতির ধরণ ঃ

- চারা গজানো এবং আলু ধরার পর আক্রমণ করে।
- চারাগাছ কেটে দেয় এবং আলুতে ছিদ্র করে।
- কীড়াগুলি দিনের বেলা মাটির নীচে লুকিয়ে থাকে।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- কাটুই পোকার আক্রমণ কম হলে, গাছ দেখে দেখে গোড়ার মাটি উল্টেপাল্টে কীড়া বের করে মেরে ফেলতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে প্লাবন-সেচ দিতে হবে ।
- এক লিটার পানিতে ৫ মিঃলিঃ ক্লোরোপাইরোফস (ডারসবান) মিশিয়ে স্প্রে করে গাছের গোড়া ও মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে ।

২. সুতলী পোকা (টিউবার মথ)

থরমিয়া পারকিউলেলা

বিবরণ ঃ

- সূতলী পোকার মথ ধূসর বাদামি রঙের।
- ঝালরযুক্ত সরু ডানা আছে।
- পূর্ণাঙ্গ কীড়া ১৫-২০ মি.মি লম্বা হয়ে থাকে।
- কীড়ার রঙ্ সাদাটে বা হালকা গোলাপী।

আলুর সুতলী পোকার কীড়া ও মথ

আক্রান্ত পাতা

আক্রান্ত আলু

ক্ষতির ধরণ ঃ

- কীড়াগুলি আলুর মধ্যে লম্বা সুড়ঙ্গ বানিয়ে আলুর ক্ষতি করে।
- বাংলাদেশে কৃষকের ঘরে রাখা আলুতেও সূতলী পোকা ক্ষতি করে থাকে।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- আলু সংরক্ষণ করার আগে, সূতলী পোকায় আক্রান্ত আলু বেছে ফেলে দিতে হবে।
- বাড়িতে আলু সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটির দরজা-জানালায় 'নেট'লাগিয়ে নেয়া ভালো।

৩. জাব পোকা (এফিড)

মাইজাস পারসিকি এফিস গোছিলি রফালো সিফাম

বিবরণ ঃ

- উপরোক্ত তিন প্রকার জাব পোকার মধ্যে বেশি ক্ষতি করে মাইজাস পারসিকি ।
- পাতার নীচে সাদা বা লালচে-বাদামি রঙের জাবপোকার 'কলোনি' দেখা যায়।
- জাবপোকা ১-২ মি.মি লম্বা হয়।
- সাধারণত মাঘ মাসের (মধ্য ফেব্রুয়ারি) শেষ দিক থেকে বেশি হয়।

জাব পোকা

ক্ষতির ধরণ ঃ

- জাব পোকা পাতার রস চুষে খায়।আলু ফসলে ভাইরাস রোগের সংক্রমণ এবং দ্রুত বিস্তার ঘটায়।
- আক্রান্ত গাছের পাতার রস খাওয়ার পর সুস্থ গাছের পাতার রস খাওয়ার সময় ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটায়।
- জাব পোকার আক্রমণে প্রত্যক্ষ ক্ষতি অপেক্ষা পরোক্ষ ক্ষতি (ভাইরাস) হয় অনেক বেশি।
- ভাইরাস আক্রান্ত গাছের ডগা ও পাতা কুঁকড়ে যায়, ছোপছোপ হলুদ দাগ পড়ে।
- ভাইরাস আক্রমণের চুড়ান্ত পর্যায়ে গাছ মরে যায় এবং আলুর ফলণ দারুণ ভাবে কমে যায়।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- আগাম আবাদ (অগ্রহায়ন-মাঘ) করলে আলু ফসলে জাব পোকা এবং ভাইরাসের আক্রমণ এড়িয়ে চলা যায়।
- উদ্ভিদজাত ঔষধ হিসাবে 'বিষকাটালী' গাছের ২ কেজি পাতার রস ৮-১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ছেঁকে নিয়ে জমিতে নিয়মিত 'স্প্রে' করলে জাব পোকা দমন হয়।
- নিম্নলিখিত রাসায়নিক ঔষধ স্প্রে করেও ভালো ফল পাওয়া যায়।
  - 'ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি' : ২২৫ মিলি ঔষধ ৭ দিন পর পর প্রতি একর জমিতে স্প্রে করতে হবে।
  - 'ডায়াজিনন ৬০ ইসি': ৪৮০ মিলি ঔষধ ৭দিন পর পর প্রতি একর জমিতে স্প্রে করতে হবে।
- অবশ্যই ভাইরাজমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

৪. উড়চুঙ্গা (ক্রিকেট)

ব্রেকিট্রিপস্ পের্টেন্টোসাস্

বিবরণ ঃ

- উড়চুঙ্গা দিনের বেলা মাটির নীচে গর্তে থাকে। রাত্রে দল বেঁধে গর্ত থেকে বের হয়।

উড়চুঙ্গা (ক্রিকেট)

ক্ষতির ধরণ ঃ

- উড়চুঙ্গা আলু গাছের শিকড়,কান্ড ও আলু খেয়ে ফেলে।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- গর্ত থেকে পোকা বের করে মেরে ফেলা।
- বিষটোপ ব্যবহার ।

৫. 'টিউবার' ভক্ষণকারী পিঁপড়া

ডরিল্স্ ওরিয়েন্টালিস্

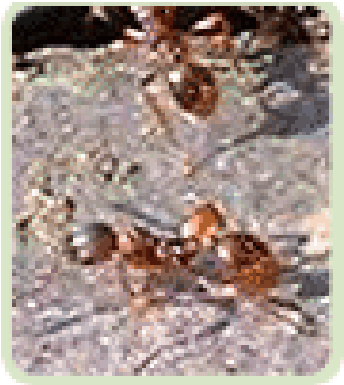

ক্ষতির ধরণ ঃ

- আলু গাছের শিকড় ও 'টিউবার' খেয়ে ফেলে।
- আক্রমণ বেশি হলে গাছ মরে যায়।
- আক্রান্ত আলুর খোসায় ও ভেতরে ক্ষত দেখা যায়।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- প্রতি একর জমিতে ডাইমেক্রন ১০০ ইসি নামক ঔষধ ২৭৫ লিটার পনিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

যেকোনো ঔষধ প্রয়োগের আগে ফসল সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিৎ ॥

রোগ-বালাই দমন

- যেকোনো রোগের আক্রমণের প্রথম দিকে আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র সাবধানে তুলে জমি থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- রোগের আক্রমণ বাড়ার আগেই সঠিক ঔষধ সঠিক নিয়মে স্প্রে করতে হবে।
- খারাপ আবহাওয়া, যেমন মেঘলা আকাশ বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে আলু ফসলের রোগ দ্রুত বেড়ে মড়ক দেখা দিতে পারে।
- রপ্তানিযোগ্য উন্নতমানের আলু উঃপাদনের জন্য পূর্ব পরিকল্পিত "স্প্রে সিডিউল" মেনে নিয়মিত ঔষধ দেয়াই উত্তম।
- অবশ্যই পরীক্ষিত নীরোগ বীজ ব্যবহার করতে হবে ।
- কার্তিক মাসে বীজআলু রোপণ করে মাঘ মাসের প্রথমদিকে ফসল তোলা হলে অনেক ক্ষতিকর রোগ, বিশেষত ভাইরাস রোগ এড়ানো যায়।

☐ বিভিন্ন কারণে আলুর বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। কারণগত বিচারে আলুর রোগগুলিকে কয়েকটি ভাগে তালিকাবদ্ধ করা চলে।

(ক) ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট রোগ,
(খ) ব্যাক্টেরিয়া ,, ,, ,,
(গ) কৃমি ,, ,, ,,
(ঘ) অপরজীবী ,, ,, ,,

☐ আলু ফসলের কয়েকটি বিশেষ ক্ষতিকারক রোগ-বালাইয়ের পরিচিতি এবং দমন-পদ্ধতি

(ক) ছত্রাকজনিত রোগ

১. **নাবি ধ্বসা/ আলুর মড়ক**

'লেট ব্লাইট' রোগ

ছত্রাক : 'ফাইটোপথোরা ইনফেস্টান্স'

বিবরণ ঃ

- আক্রান্ত পাতা, কান্ড এবং ডগায় ছোটো ছোটো ভিজা দাগ পড়ে। দাগগুলি ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে সমগ্র পাতা, ডগা এবং কান্ডের বেশ কিছু অংশে ছড়িয়ে যায়।
- পাতায় বাদামি রঙের ঘা হয়। দাগগুলি পরে কালো হয়ে যায়।
- আবহাওয়ার আর্দ্রতা বেশি হলে ২/৩দিনের মধ্যেই সারা জমিতেই রোগ ছড়িয়ে পড়ে।
- আক্রান্ত গাছগুলি নিস্তেজ এবং পোড়া পোড়া দেখায়।

আলুর মড়ক/নাবি ধ্বসা রোগাক্রান্ত গাছের পাতা

আক্রান্ত গাছের আলু

ক্ষতির ধরণ ঃ

- আলুর রঙ বাদামি হয়ে যায়।
- ফলণ মারাত্মক কমে যায়।
- আলু তোলার পর বেশি দিন রাখা যায় না।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার।
- রোগ বিস্তারের পূর্বে প্রতি একরে 'ডাইথেন এম ৪৫' বা সমমানের কোনো ছত্রাকনাশক জাতীয় এক কেজি ঔষধ ৫০০লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২দিন পর পর জমিতে নিয়মিত স্প্রে করতে হবে।
- আলুগাছ আক্রান্ত হলে একই পরিমানে 'রিডোমিল এম জেড' নামক ঔষধ স্প্রে করেও ভালো ফল পাওয়া যায় ।

২. আগাম ধ্বসা / পাতার দাগ

'আরলি ব্লাইট' রোগ

ছত্রাক : অলটানেরিয়া সোলানি

বিবরণ ঃ

- পাতার উপর বাদামি রঙের বহু-চক্রাকার কৌণিক দাগ দেখা যায়।
- পাতার বোঁটা ও কান্ডের দাগ কিছুটা লম্বা ধরণের হয়।
- ধীরে ধীরে চক্রাকার দাগগুলি বড় হয় এবংকালো রং ধরে। পাতা মরে যায়।
- নীচের দিকের পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়।
- কয়েকটি লক্ষণীয় উপসর্গ : পাতা ঝরে পড়া, গাছ হলদে হওয়া এবং অকালে মরে যাওয়া

আলুর আগাম ধ্বসা রোগাক্রান্ত পাতা

আলুর আগাম ধ্বসা রোগাক্রান্ত আলূ

ক্ষতির ধরণ ঃ

- আক্রান্ত আলুর গায়ে বাদামি থেকে কালচে দাগ পড়ে।
- আলুর ফলণ এবং মান হ্রাস পায়।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- সুপরিকল্পিত শস্য-পর্যায় অনুসরণ ।
- আগাম আলু চাষ করে আগাম ধ্বসা রোগ এড়ানো যায়।
- সুষম সার প্রয়োগ এবং সময়মত সেচ দিয়ে কার্যকর ভাবে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- আগাম ধ্বসা রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম 'রোভারাল' মিশিয়ে ৭ থেকে ১০দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। অথবা
- প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম 'ডাইথেন এম ৪৫' মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- বিধিমত অন্য কোনো ছত্রাকনাশকও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩. কান্ড ও আলু পচা রোগ

ছত্রাক : স্ক্লেরোসিয়াম রলফসি

বিবরণ ঃ

- আক্রান্ত গাছের কান্ডের গোড়া বাদামি দাগে ছেয়ে যায়।
- পাতা, বিশেষত নীচের পাতা হলদে হয়ে যায়।
- গাছের আক্রান্ত অংশে এবং আশেপাশের মাটিতে জালের মত সাদা ছত্রাক দেখা যায়। পরে সরিষা দানার মত রোগ জীবাণুর গুটি বা 'স্ক্লেরোসিয়া' সৃষ্টি হয়।

কান্ড ও আলু পচা রোগাক্রান্ত গাছ

ক্ষতির ধরণ ঃ

- আক্রান্ত আলুর গা থেকে পানি বের হয়।
- আলুতে পচন ধরে এবং সহজেই নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- জমি গভীর করে চাষ করতে হবে।
- জমিতে যথেষ্ট পরিমানে জৈবসার প্রয়োগ করতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ কিছুটা মাটিসহ জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৪. 'স্টেম ক্যাংকার' / 'স্কার্ফ' রোগ

ছত্রাক : রাইজোক্টোনিয়া সোলানি

বিবরণ ঃ

- নতুন গজানো অঙ্কুরের মাথায় এবং 'স্টোলনে' রোগাক্রান্ত দাগ দেখা যায়।
- অঙ্কুর পচে যায়।
- আক্রান্ত অংশে সাদা তূলার মত 'মাইসেলিয়াম' দেখা যায়।
- বড় গাছের গোড়ার দিকে লালচে রঙের লম্বা দাগ বা পচন/ ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- কান্ডের গায়ে ছোটো ছোটো 'টিউবার' দেখা যায়।

আলুর স্টেম ক্যাঙ্কার রোগের লক্ষণ

ক্ষতির ধরণ ঃ

- আক্রান্ত টিউবারের গায়ে সুপ্ত রোগ-জীবাণুর গুটি লেগে থাকে।
- আলুর ফলণ এবং মান হ্রাস পায়।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- রোগমুক্ত অথবা উত্তমরূপে শোধিত বীজআলুর ব্যবহার।
- অঙ্কুর বের হওয়ার আগে ২% 'বোরিক এসিড সলিউশন' দিয়ে বীজ আলু (টিউবার) শোধন করা যায়।
- পরিকল্পিত শস্য-পর্যায় অনুসরণ।
- মাটি শোধন।
- হাল্কা মাটির স্তর দিয়ে রোপিত বীজ ঢেকে দেয়া।
- প্রাক-অঙ্কুরিত বীজআলু রোপণ।

৫. আলুর দাদ রোগ

'স্কেবিজ' রোগ

ছত্রাক : স্ট্রেপ্টোমাইসিস স্কেবিজ

বিবরণ ঃ

- জমিতে পর্যাপ্ত পানি/রসের অভাবে রোগ হয়ে থাকে।
- হালকা আক্রমণে আলুর গায়ে বিভিন্ন আকারের ভাসা ভাসা বা উঁচু দাগ পড়ে।
- আক্রমণ বেশি হলে আলুর গায়ে গোলাকার গর্ত বা দেবে যাওয়া দাগ পড়ে।

দাদ রোগে আক্রান্ত আলু

ক্ষতির ধরণ ঃ

- দাদ রোগের আক্রমণ প্রধানত আলুর ত্বকে সীমাবদ্ধ থাকে।
- আলুর মান দারুণভাবে হ্রাস পায়।
- অধিক আক্রমণে ফলণ কমে যায়।
- দাদ রোগে আক্রান্ত আলু রফতানির অযোগ্য হয়ে পড়ে।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার।
- ২% বোরিক এসিড দিয়ে বীজ শোধণ।
- অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার করা চলবে না।
- উপযুক্ত সেচ দিয়ে জমিতে সব সময় পর্যাপ্ত রস বজায় রাখতে হবে।
- অধিক ক্ষারযুক্ত মাটি (পিএইচ ৭এর বেশি) হলে জমিতে ইউরিয়া সারের বদলে এ্যামোনিয়াম সালফেট সার দিলে এ রোগ হয় না।

খ. ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ

(১) **বাদামি পচন / ঢলে পড়া**

'ব্রাউন রট' রোগ

ব্যাক্টেরিয়া : রলস্টিনিয়া সোলানেসিরাম

বিবরণ ঃ

- আক্রান্ত গাছের যেকোনো একটি শাখা বা এক অংশ ঢলে পড়তে পারে।
- পাতা সাধারনত হলুদ হয় না, সবুজ অবস্থাতেই ঢলে পড়ে এবং ক্রমশ মারা যায়।
- গাছের গোড়ার দিকে আক্রান্ত অংশ কাটলে বাদামি রঙের দেখা যায়।
- আক্রান্ত গাছের আলুও বাদামি রঙের হয়।
- আক্রমণ বেশি হলে আলুর 'চোখ' কালো হয়ে যায়।

আলুর ঢলে পড়া ও বাদামি পচন রোগে আক্রান্ত গাছ

ক্ষতির ধরণ ঃ

- আলু পচে উগ্র দুর্গন্ধ ছড়ায়।
- চাপ দিলে আলু থেকে একপ্রকার দূষিত পানি বেরিয়ে আসে।
- ফলণ ও মানের দারুণ ক্ষতি হয়।
- এ রোগে আক্রান্ত আলু রফতানি করা উচিৎ নয়, জাহাজেই পচণ ধরতে পারে।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- পরিচ্ছন্ন শস্য-পর্যায় অনুসরণ করা।
- ফসল তোলার আগে উচ্চ তাপ এড়ানোর জন্য আগাম চাষ করা।
- রোগমুক্ত বীজআলু আস্ত রোপন করা।
- অতিরিক্ত সেচ দেয়া চলবে না।
- রোগাক্রান্ত গাছ জমি থেকে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ফসল তোলা, পরিবহন এবং সংরক্ষণের সময় সাবধান থাকতে হবে যেন আলুতে আঘাৎ না লাগে।
- খুব ভালোভাবে বাছাই করা আলু সংরক্ষণ করতে হবে।

(২) **কালো পা / নরম পচা**

'ব্ল্যাক লেগ' / 'সফট রট' রোগ

ব্যাক্টেরিয়া : এরউনিয়া ক্যারেটোভোরা

বিবরণ ঃ

- আক্রান্ত গাছের পাতা কুঁকড়ে যায়।
- গাছের কান্ডের ওপর কালো পিচ্ছিল ঘা দেখা যায়।
- পাতা হলুদ হয়ে ঢলে পড়ে।
- গাছের আক্রান্ত অংশে কালচে-ঘিয়ে রঙের নরম দাগ হয় এবং সুস্থ অংশ থেকে সহজেই আলাদা করা চলে।
- আলুর আক্রান্ত অংশ পঁচে যায়।

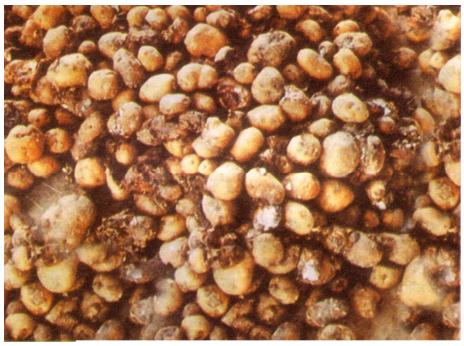

নরম পচা রোগাক্রান্ত আলু

ক্ষতির ধরণ ঃ

- আলু পচে উগ্র দুর্গন্ধ ছড়ায়।
- চাপ দিলে আলু থেকে একপ্রকার দূষিত পানি বেরিয়ে আসে।
- ফলণ ও মানের দারুণ ক্ষতি হয়।
- এ রোগে আক্রান্ত আলু রপ্তানিযোগ্য না করাই ভালো।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- পরিচ্ছন্ন শস্য-পর্যায় অনুসরণ করা।
- ফসল তোলার আগে উচ্চ তাপ এড়ানোর জন্য আগাম চাষ করা।
- রোগমুক্ত বীজআলু আস্ত রোপন করা।
- বীজআলু রোপণের আগে জমিতে একরপ্রতি ১০কেজি 'ফুরাডন' দিয়ে মাটি শোধন করা।
- অতিরিক্ত সেচ অবশ্যই পরিহার করতে হবে।
- রোগাক্রান্ত গাছ জমি থেকে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ফসল তোলা, পরিবহন এবং সংরক্ষণের সময় সাবধান থাকতে হবে যেন আলুতে আঘাত না লাগে।
- খুব ভালোভাবে বাছাই করা আলু সংরক্ষণ করতে হবে।

গ. কৃমিজনিত রোগ

(১) **শিকড় ফোলা / শিকড়ে গিঁট**

'রুট নট' রোগ

কৃমি/'নিমাটোড' : মেলয়ডোগায়নী গোত্র

বিবরণ ঃ

- গাছের বাড়ন থেমে যায়।
- পাতা ফ্যাকাশে হয়ে ঝড়ে পড়ে।

শিকড় ফোলা রোগে আক্রান্ত আলু

আক্রান্ত গাছের শিকড়

ক্ষতির ধরণ ঃ

- আলু আকারে ছোটো এবং সংখ্যায় কম হয়।
- আলুর (টিউবার) আকার বিকৃত হয়।
- আলুর ফলণ ও মান হ্রাস পায়।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার।
- রোগাক্রান্ত গাছ আলুসহ তুলে ফেলা।
- উপযুক্ত কীটনাশক ব্যবহার করেও সুফল পাওয়া যায়।

ঘ. ভাইরাসজনিত রোগ

(১) **পাতা মোড়ানো**

'লিফ রোল' রোগ

ভাইরাস : আলুর পাতা মোড়ানো ভাইরাস
'পটেটো লিফ রোল ভাইরাস -পিএলআরভি'

বিবরণ ঃ

- আক্রান্ত পাতা ফ্যাকাশে হলুদ হয়ে যায়।
- মোড়ানো পাতা শক্ত, পুরু ও খসখসে হয়।
- পাতার কিনারা লালচে-বেগুনি হতে পারে।
- আক্রান্ত গাছ নাড়া দিলে ঘরঘর শব্দ হয়।

আলুর পাতা মোড়ানো রোগে আক্রান্ত গাছ

ক্ষতির ধরণ ঃ

- আলু আকারে ছোটো হয়।
- গাছে আলু কম হয়।
- ফলণ অনেক কমে যায়।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার।
- জাবপোকার আক্রমন এড়াতে আলু আগাম আবাদ করা।
- প্রতিবন্ধক বা 'বেড়া ফসল' আবাদ করা।
- 'সিস্টেমিক' কীটনাশক প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

(২) পটেটো ভাইরাস - ওয়াই

বিবরণ ঃ

- আক্রান্ত গাছের পাতায় হলদে 'মোজাইক' হয়।
- পাতার শিরা কালো হয়ে যায়।
- অনেক সময় আক্রান্ত পাতা ঝরে পড়ে এবং পত্রহীন গাছের 'ডাঁটি' (কান্ড) দাঁড়িয়ে থাকে।

আলুর মোজাইক রোগ

ক্ষতির ধরণ ঃ

- আলু আকারে ছোটো হয়।
- গাছে আলু কম হয়।
- ফলণ অনেক কমে যায়।

প্রতিকার পদ্ধতি ঃ

- রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার।
- জাবপোকার আক্রমন এড়াতে আলু আগাম আবাদ করা।
- প্রতিবন্ধক বা 'বেড়া ফসল' আবাদ করা।
- 'সিস্টেমিক' কীটনাশক প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। কৃষি প্রযুক্তি হাত বই ২য় খন্ড - বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনষ্টিটিউট।

২। আলু ক্ষেতে প্রধান প্রধান রোগ বালাই ও পোকামাকড় এবং তার দমন ব্যবস্থা - বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনষ্টিটিউট